Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 59
July-September, 2019

ইসলামী সভ্যতায় গ্রন্থাগার : পরিপ্রেক্ষিত স্বর্ণযুগ

Library in Islamic Civilization: Perspective of Golden Ages

Mohammad Arifur Rahman*

ABSTRACT

Library is considered as the storehouse of human history, heritage and knowledge. The inevitable necessity of preserving knowledge as well as its furthereance necessitated the establishment of libraries in ancient times and their gradual expansion. In course of time lots of rich libraries were established in golden ages under the auspices of Muslim rulers. This magnificent initiative effectively spreaded knowledge in different parts of society. Moreover, these libraries played a pivotal role in the advancement of civilization. This article has endeavoured to explore the historical background of library and the magnanimous influence of library in the topography of Islamic civilization. This paper has demonstrated that library has played a crucial role in the development and enrichment of Islamic Civilization. During the dowfall of Islamic Civilization most of the libraries faced the fate of destruction. The tragic siege of Baghdad by Halagu Khan and the consequential demolition of 'Baitul Hikmah' can be cited as one of the barbaric incidents of history. The author laments that destruction of libraries causes irreparable damage to the mankind.

Keywords: library; Islamic civilization; golden ages; baghdad; *baitul hikmah*.

সারসংক্ষেপ

গ্রন্থাগারকে মানবজাতির ইতিহাস ঐতিহ্য ও জ্ঞান সাধনার সূতিকাগার গণ্য করা হয়। জ্ঞানসম্ভারের সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে প্রাচীনকাল থেকে গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হয় এবং কালপরিক্রমায় তার বিকাশ ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বর্ণযুগে ইসলামী সভ্যতায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনেক সমৃদ্ধ

* Dr Mohammad Arifur Rahman is the Deputy Librarian of Bangladesh Islami University, Dhaka, email: librarian@biu.ac.bd

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানবসমাজে বিপুলভাবে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়। সভ্যতার বিকাশ সাধনে এসব গ্রন্থাগার মূল নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে গ্রন্থাগারের ইতিহাস এবং ইসলামী সভ্যতায় গ্রন্থাগারের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক (Descriptive Method) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামী সভ্যতার বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে গ্রন্থাগার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠে অসংখ্য পাঠাগার। কিন্তু ইসলামী সভ্যতার পতনের যুগে অধিকাংশ গ্রন্থাগার বিনষ্ট করে দেয়া হয়। বিশেষ করে মোঙ্গল নেতা হালাকু খাঁ (মৃ. ১২৬৫ খ্রি.) কর্তৃক বাগদাদ আক্রমণ ও 'বায়তুল হিকমাহ্' (House of Wisdom) নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থাগার ধ্বংস করা দেয়া ইতিহাসের এক মর্মান্তিক ঘটনা। এসব গ্রন্থাগার ধ্বংসের ফলে মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

মূলশব্দ : গ্রন্থাগার; ইসলামী সভ্যতা; স্বর্ণযুগ; বাগদাদ; বায়তুল হিকমাহ ।

ভূমিকা

গ্রন্থাগারকে বলা হয় সভ্যতার বাহন। মানবজাতির ইতিহাস ঐতিহ্য ও জ্ঞান সাধনাকে যুগ থেকে যুগান্তরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ গ্রন্থাগার। সভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞান সাধনার সূতিকাগার হিসেবে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। জ্ঞানসম্ভারের সংরক্ষণ ও চর্চার প্রয়োজনীয়তা থেকে যুগে যুগে গুণী মনীষীরা গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইতিহাসখ্যাত প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী থেকে শুরু করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীসহ প্রতিটি লাইব্রেরীই সভ্যতার বিকাশ সাধনে অপরিসীম ভূমিকা রেখেছে। স্বর্ণযুগের ইসলামী সভ্যতায় গ্রন্থাগার ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক উর্বর চারণভূমি। মুসলিম শাসকগণ জ্ঞান চর্চা ও বিকাশের জন্য বিভিন্ন শহর নগর ও জনপদে অনেক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিজরতপূর্বক সেখানে মসজিদে নববীতে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে ইসলামী সভ্যতায় বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে মহানবী সা.-এর নির্দেশিত পন্থায় জ্ঞান চর্চার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এরপর আস্তে আস্তে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার লাভ করে এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারের কার্যক্রমও পরিচালিত হয়। উমাইয়া শাসনামলে (৬৬১ থেকে ৭৫০ খ্রি.) দামেস্কে রাজকীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, আব্বাসীয় শাসনামলে (৭৫০ থেকে ১০৫০ খ্রি.) বাগদাদে বায়তুল হিকমাহসহ আরো অনেক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীকালেও অন্যান্য মুসলিম শাসকরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞানের সেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সেলজুক শাসক নিজামুল

মুলক (১০১৭-১০১৯ খ্রি.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমসাময়িককালের অন্যতম সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কায়রোতে ফাতেমীয় খলীফাগণ অসংখ্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। খলীফা আল আজিজ (৯৭৫-৯৯৬ খ্রি.) এবং তার পুত্র হাকাম কতৃর্ক প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার তার উজ্জ্বল নিদর্শন। অপরদিকে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে স্পেন বিজয়ের পর সেখানেও মুসলিম নৃপতিরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এসব গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ মুসলিম স্পেনের বাতিঘর হিসেবে কাজ করে। সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগের ইসলামী সভ্যতায় গ্রন্থাগারের অপরিসীম দানে সোনালি যুগের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময়ে শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানরা উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছিল। মধ্যযুগের সেই সমুন্নত ইসলামী সভ্যতার অবদান ইতিহাসের পাতায় বিধৃত হয়েছে। দুঃখজনকভাবে ইসলামী সভ্যতার পতনের যুগে মুসলিম বিশ্বে গড়ে ওঠা এ বিপুলসংখ্যক লাইব্রেরী নজিরবিহীন ধ্বংসযজ্ঞের কবলে পড়ে। শত্রুরা বর্বরোচিতভাবে এবং পাশবিকতার সঙ্গে এইসব জ্ঞানভাণ্ডারকে ধ্বংস করে দেয়। এ ধ্বংসযজ্ঞের ফলে বিশ্বমানবতা বঞ্চিত হয়েছে লাইব্রেরীগুলোতে রক্ষিত হাজার বছরের প্রাচীন জ্ঞানসম্ভার হতে। এই মূল্যবান সম্পদ ধ্বংসের কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে ক্ষয়ক্ষাতি হয়েছে তা কখনও পূরণ হওয়ার নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় মধ্যযুগের (৬২২- ১৪৫৩ খ্রি.) মুসলমানদের অবদান এবং এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারের পরিচয়

জ্ঞানসম্ভারের সংরক্ষণ, চর্চা ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তা থেকে প্রাচীনকাল থেকে গ্রন্থগারের যাত্রা শুরু হয়। মানবজাতির কৃতিত্বপূর্ণ অজর্নগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অজর্ন হচ্ছে এ গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Library'। আর এ Library-এর উৎপত্তি হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ Liber থেকে, যার অর্থ 'পুস্তক' (SOED 2007, 1572)। আবার Liber শব্দটি এসেছে Librium শব্দ থেকে। যার অর্থ পুস্তক রাখার স্থান। এ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ শব্দ Librarie অর্থ হলো পুস্তকের সংগ্রহ (Banglapedia, 4/128)। জ্ঞানের সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও যুগ পরম্পরায় জ্ঞান সম্ভার পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারের উদ্ভব। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার হচ্ছে এমন একটি সেবা দানকারী গুণী প্রতিষ্ঠান, যেখানে ছাত্র শিক্ষক, অন্যান্য পাঠক ও গবেষকদের জন্য বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, জার্নাল, থিসিস পেপারসহ অন্যান্য জ্ঞানসামগ্রী কাঠামোগত পদ্ধতিতে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা হয়। গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আলোকিত মানুষ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সহযোগিতা করা।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে গ্রন্থগারের এক অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। তিনি বলছেন- "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুদের মতো চুপ করিয়া থাকিব, তবে সে নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হয়ে আছে মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এ লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে (Tagore 2011, 27)।" তিনি আরো বলেন- "শব্দের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শোনা যায়, তেমনি এ লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতেছ। এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো এক সঙ্গে থাকে; সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবন নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না (Ibid.)।"

গ্রন্থাগারের ইতিকথা

গ্রন্থাগারের ইতিহাস বেশ পুরোনো। আদিকাল থেকেই মানুষ কোনো না কোনোরূপে লিপিবদ্ধ জ্ঞানকে সংরক্ষণ করে আসছে। প্রাচীনকালে মানুষ লেখার উপকরণ হিসেবে যেসব বস্তু ব্যবহার করত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: মাটির ফলক (Clay Tablet), পাথর (Stone), প্যাপিরাস (Papyrus) কডেক্স (Codex), তালপাতা, হাতির দাঁত ইত্যাদি (Casson 2002, 3)। লিখিত জ্ঞানসম্ভারকে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থেকে গ্রন্থাগারের উদ্ভব। ইতিহাসের একেবারে প্রাথমিক পর্বে গ্রন্থাগারগুলো আধুনিক গ্রন্থাগারের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন রকম ছিল। প্রথম দিকে মানুষ নিজের ঘরের কোণে, উপাসনালয়ে ও রাজকীয় ভবনে গ্রন্থ সংরক্ষণ করতে শুরু করে। গ্রন্থাগার ইতিহাসবিদরা এগুলোকে 'প্রোটো লাইব্রেরী' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এগুলো ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে গড়ে তোলা সংগ্রহশালাগুলো সময়ের বির্বতনে গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। গ্রন্থাগার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্দিরে গড়ে ওঠা সংগ্রহশালাগুলোই গুরুত্বের বিচারে এগিয়ে ছিল। মিশর, প্যালেস্টাইন, ব্যাবিলন, গ্রিস এবং রোমে গ্রন্থাগারের প্রাচীনতম এবং গুরুত্বের দিক থেকে মন্দির গ্রন্থাগার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে (Ibid.)। গুরুত্বের দিক দিয়ে এরপরই উল্লেখ করতে হয়, সরকারি দলিল-দস্তাবেজের সংগ্রহ বা আর্কাইভসের কথা। গ্রন্থাগারের আদিমতম নিদর্শনগুলোর মধ্যে সরকারি নথির সংগ্রহাগার একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এসব দলিলপত্র লিপিবদ্ধ হত পোড়ামাটির ফলক, প্যাপিরাস বা পার্চমেন্ট

রোল এবং কখনও তাম্র বা ব্রোঞ্জপাত্রে। তবে যে আকারেই সংরক্ষিত হোক না কেন, সরকারি কর্মকাণ্ডের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে ইতিহাস রচনার একটি অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে এসব সংগ্রহ। সরকারি দলিল ও মন্দির সংগ্রহের মতই ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ সৃষ্ট দলিলপত্রও গ্রন্থাগার উদ্ভবের আদি পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন (Roberts 1997, 35)। মিশর, ফিনিশীয়া, ব্যাবিলন এবং পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রিয়া, এথেন্স ও রোমের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রগুলোতে এ ধরনের সংগ্রহ প্রচুর দেখা যেত। গ্রন্থাগারের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সংগ্রহও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। লিখিত দলিলপত্রের সবচেয়ে প্রাচীন উদাহরণগুলোর মধ্যে বেশ কিছু দলিল আছে, যেগুলো ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে লেখা। ব্যাবিলনের অধিবাসীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির পূর্বাভাস বা পূর্বলক্ষণের বিবরণ পারিবারিক সংগ্রহে যোগ করার প্রবণতা ছিল। ধর্মীয় কাহিনী ও ভাষ্য, পুরাণ ও লোককাহিনী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক নথিপত্র পারিবারিক সংগ্রহে যুক্ত হয়ে এগুলোকে আদর্শ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পরিণত করেছিল। এভাবেই পারিবারিক আর্কাইভসমূহ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের পূর্বসূরী হিসেবে কাজ করেছিল এবং গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার একটি অতি স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়। ইতিহাসখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী, ব্যাবিলন লাইব্রেরী, আসুরবানিপাল লাইব্রেরী, নালন্দা লাইব্রেরী, পারগামাম লাইব্রেরী, কর্ডোবা লাইব্রেরী ইত্যাদি (Stille 2002, 246-273)। নিম্নে কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো।

আসুরবানিপাল গ্রন্থাগার

উদ্ভবের দিক থেকে গ্রন্থাগারের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঠিক কবে গ্রন্থাগার প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তার সঠিক ইতিবৃত্ত জানা দুরূহ। তবে অনুমান করা হয় যে, সুপ্রাচীন অ্যাসিরিয় সভ্যতায় গ্রন্থাগারের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অ্যাসিরিয়ান সভ্যতার অন্যতম রাজা আসুরবানিপাল (৬৬৮ - ৬২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী নিনেভহ (Nineveh)-এ একটি জাতীয় গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন (Polastron 2007, 2-3)। তিনি একাধারে সেনাপতি ও যোদ্ধা, শাসক এবং গ্রন্থপ্রেমী ও বাস্তব গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তাঁর নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার বা সংগ্রহশালা ছিল। তাঁর সম্পর্কে একটি উক্তি প্রচলিত আছে যে, 'Assurbanipal was first of all a warrior, then an administrator, and finally a librarian. গ্রন্থপ্রেমী রাজার নামানুসারে ইতিহাসের সর্বপ্রাচীন এ গ্রন্থাগারটি 'আসুরবানিপাল লাইব্রেরী' নামে পরিচিতি। এ গ্রন্থাগারটি প্রায় ৩০,০০০ মৃন্ময়-চাকতি দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল (Wedgeworth 1993, 86)।

আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার

ইতিহাস বিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার হচ্ছে প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার। এটি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে অবস্থিত ছিল (Hossen 2004, 180-181)। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মিশরের টলেমিক রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় এই গ্রন্থাগারটি গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত রাজা টলেমি প্রথম সোটারের (৩২৩-২৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) অথবা তাঁর পুত্র টলেমি দ্বিতীয় ফিলাডেলফাসের (২৮৩-২৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজত্বকালে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (Murray 2009, 17)। এই গ্রন্থাগারে বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পাশাপাশি, পাঠকক্ষ, সভাকক্ষ, ফুলের বাগান প্রভৃতি ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থাগার ছিল এক বৃহত্তর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অংশ। এখানে প্রাচীন বিশ্বের বহু বিশিষ্ট দার্শনিক পড়াশোনা করেছিলেন (Jochum, 5-12)।

আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার অনেকবারই যুদ্ধ আর অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৮৯-৮৮ অব্দে টলেমী-VIII-এর শাসনামলে প্রথম অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়। এই সময়ে দেশে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং লাইব্রেরীতে অগ্নিসংযোগ ঘটে (Ibid.)। পরবর্তীতে আরো কয়েকবার অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়ে গ্রন্থাগারটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মূল গ্রন্থাগারটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর গবেষকরা আলেকজান্দ্রিয়া শহরেরই অন্য প্রান্তে সেরাপিয়াম নামে এক মন্দিরে একটি ছোটো গ্রন্থাগার ব্যবহার করতেন। পোপ থেওপিলাস ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটিও ধ্বংস করে দেন। এভাবে বহুবার ধ্বংসযজ্ঞের কবলে পড়ে ঐতিহাসিক এ গ্রন্থাগারটি সমূলে বিনাশ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রা.-এর (৬৩৪-৩৪৪ খ্রি.)-এর শাসনামলে 'আমর ইবনুল আস রা.-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা মিশর বিজয় করেন। অভিযোগ করা হয় যে, মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়কালে খলীফা উমর সেখানকার এক প্রাচীন দুর্লভ পাণ্ডুলিপিসমৃদ্ধ লাইব্রেরীর সংগ্রহ আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করান। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক ও সমালোচকগণ গবেষণার মাধ্যমে চাক্ষুষ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এ ঘটনা মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণে দেখা গেছে যে, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী উমরের সময়কালে মিশর বিজয়ের বহু পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। রাজা টলেমি সোটরের পুত্র টলেমি ফিলাডেলফাস (২৮৫-২৪৭ খিস্টপূর্ব)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীর ক্যাটালগ পরীক্ষা করে দেখা যায়, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি বিলুপ্ত হয়। ঐতিহাসিকদের ধারণা মতে ৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজারের আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণকলে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (Ruth Stellhorn 1935)।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে ঘিরে জ্ঞান চর্চা ও পাণ্ডুলিপি রচনার এক বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছিল। বর্তমান ভারতের বিহারের মগধে ৪১৩ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (Scharfe 2002, 149)। নালন্দার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সম্রাট কুমারগুপ্তকেই বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীতে পাল রাজাদের আমলে নালন্দা শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ অগ্রগতি লাভ করে। পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তাদের উদার নৈতিক নীতির কারণে নালন্দা পেয়েছিল বিশাল এক সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা। নালন্দায় সংরক্ষিত পুস্তকের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও ধারণা করা হয়, সেখানে প্রায় নব্বই লক্ষাধিক পুস্তক সংরক্ষিত ছিল। গ্রন্থাগারটি তিনটি পৃথক দালানে বিস্তৃত ছিল। এই তিনটি ভবনের নামছিল রত্নবোধি (Ocean of pearls), রত্নসাগর (Sea of pearls) এবং রত্নরঞ্জক (Pearls of recreation)। এদের মধ্যে রত্নদধির ছিল প্রায় নয়তলা বিশিষ্ট ভবন (Ibid. 159)। এখানে হাতে লেখা পুঁথি থেকে শুরু করে ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, সাহিত্য, জ্যোতিষশাস্ত্র, মহাকাশবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি নানা বিষয়ের ওপর হাজার-হাজার বই ছিল সেখানে (Abdul Aziz 2013, 26)।

মধ্যযুগের পরিব্যাপ্তি ও ইসলামী স্বর্ণযুগ

বিশ্বইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কালকে মধ্যযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কখন থেকে এটি শুরু হয় এবং কখন এটি শেষ হয়, সর্বোপরি এর পরিব্যাপ্তি নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইউরোপীয় ইতিহাসের আলোকে মধ্যযুগ বিবেচনা করা হয় ৪৭৬ হতে ১৪৯২ সালের আগ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর সময়কালকে। এ সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের পতন, আধুনিক ইউরোপের নব যাত্রা, ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নতুন বিশ্ব আবিষ্কার, ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগের সুচনাসহ ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এসব কারণে এ সময়কালটিকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়। যথা : মধ্যযুগীয় সময় (Medieval Age), অন্ধকারের যুগ (the Dark Ages) এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের যুগ (the Age of Faith) ইত্যাদি (Ibid.)।

অপরদিকে এ সময়টিতেই ইসলামের আবির্ভাব, ইসলামী সোনালি যুগের প্রবর্তন ও সমাপ্তি, বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের পতন, ক্রুসেডের যুদ্ধ ও এর প্রভাবসহ নানা ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আরব দেশের পবিত্র মক্কা নগরীতে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব হয়। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ব ইতিহাসের

এক জটিল পরিস্থিতিতে তাঁর আবির্ভাব হয় এবং তিনি জাহেলিয়্যাতের কঠিন চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করে আল কুরআনের শিক্ষা ও তাঁর সুমহান চরিত্রের মাধ্যমে তিনি বিশ্বে একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তিনি পরিণত হন বিশ্ব ইতিহাসের সর্বাধিক আলোচিত, প্রশংসিত এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বরূপে। তাঁর সুমহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নেতৃত্বের অসাধারণ গুণাবলি এবং সৌন্দর্য ও সুকীর্তির সমন্বয়ে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁর এ আবির্ভাব ও নতুন বিশ্বব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে সোনালি যুগ শুরু হয়। তাঁর পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার সময়কাল, উমাইয়া যুগ (৬৬১-৭৫০ খ্রি.), আব্বাসীয় যুগ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.), ফাতেমীয় যুগ (৯০৯-১১৭১ খ্রি.) ইত্যাদির ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ১৯২২ সালে তুরস্কের উসমানীয় খেলাফতের পতনের মাধ্যমে ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হয়। এ দীর্ঘ সময়কালে মুসলমানরা বিশ্বে এক নতুন সভ্যতার জন্ম দেন। ইসলামের ইতিহাসের এ দীর্ঘ সময়কাল সৃষ্টিশীলতার দিক থেকে সকল যুগ সমান না হলেও সামগ্রিকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিশেষ করে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের সৃষ্টি ও বিকাশের জন্য 'সোনালি অধ্যায়' (The Islamic Golden Age) হিসেবে বিবেচিত হয় (Wani 2012, 207)।

তথাপি ইসলামী সোনালি যুগের ব্যাপ্তি নিয়ে গবেষকদের নানা মত রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে, সময়টা সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ আব্বাসীয় শাসনামলের পতনকাল পর্যন্ত। আবার কেউ কেউ অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীকে ধরেছেন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, অবশ্য এ সময়কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘায়িত। তবে অত্র প্রবন্ধে বক্ষ্যমাণ আলোচনা উসমানীয় খেলাফতের পূর্বযুগ (৬২২- ১৪৫২ খ্রি.) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে।

আল কুরআনে বারবার জ্ঞান চর্চার তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবী ও অনুসারীদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের বিরাট কর্মচাঞ্চল্য পরিচালিত হয়। তাঁর সময়ে সাহাবীদের শিক্ষাদানের জন্য মসজিদে নববী কেন্দ্রিক যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে সেটাই প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত (Hamidullah 2012, 204)। বস্তুত ইসলামের প্রাথমিক কাল হতে শুরু করে উমাইয়া শাসককাল (৭৫০ খ্রি.) পর্যন্ত মসজিদই ছিল জ্ঞান চর্চার বৃহত্তম বিদ্যাঙ্গন। এ প্রসঙ্গে ইতিহাস পর্যালোচক ড. আহমদ আমীন বলেন, "প্রকৃতপক্ষে তখন

মসজিদই ছিল জ্ঞান চর্চার বৃহৎ অঙ্গন। মসজিদ তখন নিছক উপাসনালয় ছিল না, সালাত আদায়ের পাশাপাশি সেখানে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হতো। এমনকি কাযী সাহেবের আদালত ও বিচারসভাও বসতো মসজিদেই। অবশ্যই এখানে আমরা এটুকু শুধু বলতে চাই যে, মসজিদ সে যুগে বিদ্যা চর্চার সর্ববৃহৎ ক্ষেত্র ছিল। মিসরের আমের মসজিদ, বসরার মসজিদ, কুফার মসজিদ, মক্কা ও মদীনার হারাম শরীফ প্রভৃতি মসজিদ জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকাই পালন করত। বস্তুত ইসলামের অন্যতম মূলনীতি হিসাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদকে জ্ঞান চর্চার অঙ্গন বানিয়েছিলেন। গোটা উমাইয়া শাসনকাল পর্যন্ত মসজিদের এ ভূমিকা অব্যাহত ছিল (Amin, 2002, 2/58)।" শুধু তাই নয়, উমাইয়া যুগের পরেও ইসলামী সভ্যতায় মসজিদ গ্রন্থাগার জ্ঞান-চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। কায়রোর তুলুন মসজিদ, আলেপ্পোর জামে মসজিদ, তিউনিসার যায়তুন মসজিদ, আল আকসা মসজিদ, বাগদাদের যায়দিয়া মসজিদ, কায়রোর আল আজহার মসজিদ, মরক্কোর আল কায়রোয়ান মসজিদ, সিরিয়ার দামেস্ক মসজিদ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস গবেষক ম্যাকারসন মসজিদ গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন-

"Books were presented and many scholars bequeathed his library to the Mosque of his city to ensure its preservation and to render the books accessible to the learned who frequented it. And so grew up the great universities of Cordova and Toledo to which flocked Christians as well as Moslems from all over the world, and the famous al-Azhar in Cairo, which after almost a thousand years is still the most famous educational centre of the Mohammedan world Mackensen 1935, 123)."

মহানবী সা.-এর অর্বতমানে তাঁর অনুসারীগণ কুরআন-হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে রাসূল (সা.)-এর সীরাত বা জীবনচরিত সংরক্ষণের প্রয়োজনে ইতিহাস রচনার দিকে মনোযোগ দেন। এর পরে কুরআন সুন্নাহ্‌র নির্দেশনা মোতাবেক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামী আইন শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের এ ধারাবাহিকতায় গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, মহাকাশ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যাসহ জীবনঘনিষ্ঠ অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান তারা আবিষ্কার করলেন। মহানবী সা.-এর ইন্তেকালের এক শতাব্দীকালের মধ্যেই ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা তথা স্পেন থেকে আরম্ভ করে ভারতের সিন্ধু নদ পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। এ বিশাল অঞ্চলজুড়ে মুসলমানরা জ্ঞান সৃষ্টি, চর্চা ও বিকাশে এক অনন্য নজীর স্থাপন করেন। এ যুগের মুসলমানরা শুধু দেশ জয় করে ক্ষান্ত থাকেননি বরং তারা বিজিত এলাকায়

জ্ঞান চর্চা ও বিকাশের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞান বিতরণের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, সম্মানিত করেছেন। মুসলমানদের উদ্যোগেই বাগদাদ, কায়রো, ফেজ, কার্ডোভাসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এমনকি সেগুলোর বিস্তৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ লাভ করেছিল। তারা শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছিল। জন্ম দিয়েছিল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের। সার্বিকভাবে বলা যায়, মুসলমানরা মধ্যযুগে জ্ঞান সৃষ্টি ও বিকাশের ক্ষেত্রে একটি সোনালি অধ্যায় রচনা করেছিলেন। ইসলামের নব উদ্দীপনা বলিয়ান হয়ে মুসলমানরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ভাষায় রচিত মনীষী, বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারকদের গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করত তা আরবী ভাষায় ভাষান্তর করেন। বিশেষ করে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করত তা আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত করা হয়। সেগুলোই পরবর্তীকালে বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম গবেষক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিকিৎসকদের আবির্ভাবের পথ তৈরি করে দিয়েছিল। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এই প্রবহমান ধারায় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ পাঠাগার। এর মধ্যে বাগদাদ, কায়রো, বোখারা, সমরকন্দ, নিশাপুর, মসুল, মার্ভ, বসরা, ইস্পাহান, শিরাজনগর, কায়রো, কর্ডভা, সেভিল, দামেস্কে, মক্কা, মদীনা প্রভৃতি নগরীতে প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগারগুলোর কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিম্নে মধ্যযুগের বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থাগারের বিবরণ প্রদান করা হলো :

১. বাইতুল হিকমাহ

ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসী যুগকে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগ বলা হয় (Ahmed 2008)। নিঃসন্দেহে এ যুগ মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। আব্বাসী শাসকগণ এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল অংশ নিয়ে সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এ সময়ে জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। আব্বাসী খলীফা আল মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ নগরীকে নতুন রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দেন (Karim 2008, 218)। এরপর থেকে প্রভাবশালী আব্বাসী খলীফাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ, অনুবাদকরণ ও গবেষণায় এক অত্যুজ্জ্বল তীর্থভূমির মর্যাদা লাভ করেছিল এ বাগদাদ। আল মানসুরের বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানচর্চার পরিপোষকতায় মুসলিম সমাজে পুস্তকপ্রীতি আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পায়। 'বাইতুল হিকমা' বা House of wisdom ছিল সেই সময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বৃহদাকার গ্রন্থাগার (Murray 2009, 55-56)। আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশিদ (শাসনকাল ৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) 'বাইতুল হিকমাহ্' প্রতিষ্ঠা করেন। তার সুযোগ্যপুত্র খলীফা আল মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)-এর সময় এটি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে

(Najirabadi 2008, 2/8)। নবম শতকের মধ্যভাগে 'বাইতুল হিকমাহ' ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থভাণ্ডার। এ বিশাল গ্রন্থকেন্দ্র ছিল একাধারে গ্রন্থাগার, অনুবাদকেন্দ্র, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং মানমন্দির। এটিকে ইসলামী স্বর্ণযুগের প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় (IFB 1994, 15/608)। বাইতুল হিকমাহ্ সম্পর্কে ইতিহাসবিদ পি.কে. হিট্টি বলেন- The first prominent institution for higher learning of Islam was the Bayt at Hikmah (the house of wisdom) founded by al Mamun (830) in his capital. Besides serving as trnslation bureau this institution fuctioned as a academy and public library and had a observatory connected with it (Hitti 2002, 88).

ব্যক্তিগতভাবে খলীফা আল মামুন ছিলেন বহু মানবিকগুণে গুণান্বিত একজন বিদগ্ধ শাসক (Ibn Kathir, 6/202)। জ্ঞানের আদান-প্রদানের জন্য আল মামুন অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিকে বাইতুল হিকমাহতে নিয়ে আসেন। বায়তুল হিকমায় ফার্সী, গ্রিক, মিশরীয়, কালদীয়, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ সংগৃহীত হতো। তাঁর উজির ইয়াহিয়া বার্মাকী বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের বাগদাদে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আরবদের 'অগাস্টাস' খ্যাত এ বায়তুল হিকমাহ্ একাধারে গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং লাইব্রেরী হিসেবে পূর্ণাঙ্গ জৌলুসপ্রাপ্ত হয় (Brentjes 2010, 569)। খলীফা আল মামুন বাগদাদের এ গ্রন্থাগারটিকে বৈশ্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাতে সে যুগেই প্রায় ৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছিল। বীজ গণিতের জন্মদাতা মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খারেজমি (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) সেই বিরাট গ্রন্থাগারের একজন লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। তিনি ভারত বিষয়ক একটি বই লিখেছিলেন- যার নাম *কিতাবুল হিন্দ*। গণিত শাস্ত্রে শূন্যের মূল্য অপরিসীম। এই শূন্য [০] আবিষ্কার তার বলে দাবি করা হয় (Ahmed 2008, 228)। ***'হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবালা*** (حساب الجبر والمقابلة) বইটি তার বিরাট অবদানের একটি উত্তম নিদর্শন। এ সময়কালটিতে বায়তুল হিকমায় বিদেশী গ্রন্থের আবরী অনুবাদের ঝরনাধারা প্রবাহিত হয় (O`Leary 2002, 155-164)। খলীফা আল মামুন ইহুদি, পারসি, খ্রিস্টান, মুসলিম নির্বিশেষে পণ্ডিতদেরকে তার অনুবাদে নিযুক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকর্মে স্থপতি ও প্রকৌশলী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কাজ করতেন। তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সরকারি দিনপঞ্জির হিসাব রাখতেন এবং সরকারি কর্মী হিসেবেও কাজ করতেন। তারা একইসাথে চিকিৎসক ও পরামর্শদাতাও ছিলেন (Al-Khalili 2011, 67-78)। খলীফা আল মামুনের কাছে সৌজন্যস্বরূপ আসতো জ্ঞানের অমূল্য সব সংগ্রহ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। তিনি সহল বিল হারুন নামক এক পারসিক ডাক্তারকে নিযুক্ত করলেন মাজুসী সভ্যতার মূল্যবান বই পুস্তকগুলো অনুবাদ করার জন্য। মামুনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে দরবারের সবার ভেতরই অনুরূপ প্রেরণা দেখা দিল। এ যুগে

যেসব বই-পুস্তক অনূদিত হয়েছিল তা গ্রিক, ফারসী, কালভী, কিবতী ও শামী ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল (O`Leary, Ibid.)। এই লাইব্রেরীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব অনুষদের পুস্তকসমূহ সংগ্রহ করা হয়। এখানে প্রায় ছয় লক্ষেরও বেশী পুস্তক সংগৃহীত হয়।

বায়তুল হিকমাহ্ 'খিজানাতুল হিকমাহ' নামেও পরিচিত ছিল (Amin 2002, 2/6)। এটি ছিল বাগদাদের সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণার মূল কেন্দ্র। এ গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল জ্যোর্তি বিজ্ঞান ও মানমন্দির। এ গ্রন্থাগারের ভূমিকা প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারকে ছাড়িয়ে যায়। এখানে বিজ্ঞানীরা দিনরাত নিরলস গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এবং লেখার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। ভারত, চীন, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ তথা বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সব প্রান্ত থেকেই জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটতো এ 'হাউজ অফ উইজডমে' জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে। এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী ও বিজ্ঞানীগণ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন: সহল ইবনে হারুন, হুনাইন ইবনে ইসহাক, মুসা আল-খাওয়ারিজমি প্রমুখ (IFB 1994, 5/608)।

খলীফা আল মামুনের উত্তরাধিকারি আল মুতাসিম (শাসনকাল ৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) ও তার পুত্র আল ওয়াসিকের সময়কাল পর্যন্ত বাইতুল হিকমাহ্ সগৌরবে জ্ঞানের আলো বিতরণের কাজ চালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে খলীফা আল মুতাওয়াক্কিলের আমলে (শাসনকাল ৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) এর অবনতি শুরু হয় (Khan 2012, 35)। ১২৫৮ সালে মোঙ্গল শাসক হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করে শহরটিকে ধ্বংস করেন। লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় লাইব্রেরী, গবেষণা কেন্দ্র । গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় মসজিদ ও দৃষ্টিনন্দন সব ভবন। এ ধ্বংসলীলায় কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান বায়তুল হিকমাহ্ও (Al-Khalili 2011, 223)।

২. নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার

বাগদাদে সেলজুক[১] সুলতানদের শাসনামলে (১০৩৭-১৩০০ খ্রি.) মহামতি সুলতান নিজামুল মুলক (১০১৭-১০৯২ খ্রি.) নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন

১. সেলজুক (আরবী ভাষায় : سلجوق সালজুক বা السلاجقة আল-সালাজিকা) একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম, যারা ১০ শতক থেকে ১৪ শতক পর্যন্ত মধ্য এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য শাসন করেছে। এই সাম্রাজ্যের স্থপতি সুলতান তুঘরিল বেগ। তিনি জাতিতে তুর্কি ছিলেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য খোরাসান, মাওয়ারাউন নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা, ইরাক, ছোট এশিয়া (আনাতোলিয়া) এবং শাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথমে ইরানের রেই, পরবর্তীকালে ইরাকের বাগদাদ সেলজুক রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। সেই সময়ে খোরাসানের মাওয়ারাউন নদীর এলাকায় (কিরমান সেলজুক), শামে (সিরিয়ান সেলজুক) এবং ছোট এশিয়াতে (আনাতোলিয়ান সেলজুক)-এর মত ছোট ছোট সেলজুক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। সুলতান মালিক বেগের শাসনকালে এই সাম্রাজ্য অর্ধ-পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এর পরবর্তীতে এই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ছোট ছোট আমিরাতে পরিণত হয়।

(Makdisi 1970, 255–264)। প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হিসেবে এবং যশ-খ্যাতি ও সমৃদ্ধির দিক থেকে এই গ্রন্থাগারের একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। সুলতান নিজামুল মুলক ছিলেন বিদ্যা উৎসাহী একজন ধর্মপ্রাণ শাসক। জ্ঞান-গবেষণা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তৎকালীন দুনিয়ার সেরা বিদ্যাপীঠ 'নিজামিয়ার' প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দরসে নিজামী'-এর প্রবক্তা সুলতান নিজামুল মুলক রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এর মধ্যে বেশকিছু গ্রন্থাগারও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজেই এগুলো তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে ৩০ বছরের অধিককাল দেশ ও জ্ঞানের সেবা করেন। ধর্মীয় ব্যাপারে ভীষণ আকর্ষণ বোধ করতেন বলে তিনি একবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বাগদাদের 'দারুল খোলাফা'-কে (রাজদরবার) ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক মত বিনিময় কেন্দ্রে পরিণত করবেন। সেটি বাস্তবায়িত না হলেও পরবর্তীতে তিনি বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলিম বিশ্বের বড়ো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেন। এর পাশাপাশি খোরাসান, দিল্লী, ইরান এবং ইরাকের বিভিন্ন শহরেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, দর্শন, নীতি শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয় সেখানকার পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে তার সাথে যুক্ত হয় উসুলূল ফিকহ্, তাফসীর, ইলমে কালাম, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, সাহিত্যসহ আরো অনেক নতুন নতুন বিষয়। নিজামুল মুলক-এর পৃষ্ঠপোষকতায় নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমসাময়িক কালের অন্যতম সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। তিনি সরকারী অনুদান ছাড়াও নিজের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতেন। প্রখ্যাত সংস্কারক ও দার্শনিক ইমাম আল গাযালী (১০৫৮-১১১১ খ্রি.) তাঁর অনুরোধে নিজামিয়া মাদ্রাসায় চার বছরকাল শিক্ষকতার দায়িত্ব পালান করেন (Griffel 2009, p. 75-77)। নিজামুল মুলক এ গ্রন্থাগারে প্রচুর বইপত্র দান করেছিলেন। বইপত্র ক্রয় এবং নানা উৎস থেকে জমা হওয়া গ্রন্থ সম্পদ এই লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করেছিল। অনেক সুধী ব্যক্তি এখানে গ্রন্থ দান করে যেতেন। ঐতিহাসিক ইবনুল আছীরের মতে, ঐতিহাসিক মুহীউদ্দীন ইবনু নজর আল বাগদাদী (মৃত্যু ১২৪৫ খ্রি.) নিজামিয়া গ্রন্থাগারে প্রচুর বইপত্র দান করেছিলেন। গ্রন্থাগারটির ভাগ্যে বিভিন্ন সময় দুর্যোগ নেমে আসে। ১১১৬ খ্রিস্টাব্দে এক মারাত্মক অগ্নিকাণ্ডের কবল থেকে বইগুলি ভাগ্যক্রমে রক্ষা পায়। গ্রন্থাগারটি অন্যত্র স্থানান্তর করার ফলে ক্ষতি থেকে বেঁচে যায়। খলিফা আল নাসির (১১৮০-১২২৫ খ্রি.) এ গ্রন্থাগারের জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণ করে দেন। এর ফলে নিজামিয়া গ্রন্থাগার মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও মুল্যবান গ্রন্থগারে পরিণত হয়। জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যাক্তিরাই এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হতেন। ১০৯৬ সালে ইমাম গাযালী যখন এ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন তখনও এখানে তিন হাজারেরও অধিক ছাত্র ছিল। পারস্যের বিখ্যাত কবি শেখ মুসলেহ উদ্দীন, যিনি শেখ সাদী নামে বিশেষ পরিচিত, তিনি ১১৯৫

থেকে ১২২৬ সাল পর্যন্ত এখানে শিক্ষালাভ করেন। এখানে ধর্মীয় বিষয়-আশয় নিয়ে যুক্তি-তর্কের আসর অনুষ্ঠিত হতো। এই প্রতিষ্ঠানটিকে মধ্যযুগের সবচেয়ে বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Josef 2000, 856)। এই গ্রন্থাগারটির প্রশাসনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত ইতিহাসের অংশবিশেষ এখনো সংরক্ষিত আছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিদ্যা উৎসাহী সুলতান নিজামুল মুলক সাম্রাজ্যের আরো বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিশাপুর শহরের ওপর তার বিশেষ দৃষ্টি থাকার কারণে এই শহরটিও জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করে। বিশিষ্ট কবি ও দার্শনিক ওমর খৈয়াম, ইমাম মোয়াফফাক নিশাপুরী, ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনী, আত্তার নিশাপুরী প্রমুখের মতো জগদ্বিখ্যাত মনীষীগণ এই নিশাপুরেই গড়ে ওঠেন। অসংখ্য মনীষী থাকার কারণে এই নিশাপুরেও একটি নিজামিয়া মাদ্রাসা ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই নিজামিয়াতেও অসংখ্য স্বনামধন্য মনীষী শিক্ষকতার গুরুদায়িত্ব পালন করেন। মানের দিক থেকে নিশাপুরের নিজামিয়াটিকে বাগদাদের পরই স্থান দেওয়া হয়। ইস্ফাহানেও তার নির্দেশে নিজামিয়া বিদ্যাঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েও অনেক নামকরা জ্ঞানী-গুণী মনীষী শিক্ষকতা করেছেন। যাদের মধ্যে আবু বকর মুহাম্মদ বিন সাবেত খোজান্দী এবং ফখরুদ্দীন আবুল মা'আলী আল-হাসান ইবন মুহাম্মদ আল-বিরকানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এই মহান প্রতিষ্ঠানটির কারণে ইস্ফাহান অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়েছিল (Kader 2010, 12-18)।

৩. মুসতানসিরিয়া মাদ্রাসা গ্রন্থাগার

মুসতানসিরিয়া মাদ্রাসা বাগদাদের একটি ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আব্বাসীয় খলীফা আল মুসতানসির (১২২৬-৪২ খ্রি.) এটি প্রতিষ্ঠা করেন (Karim 2008, 294)। এটি টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এ গ্রন্থাগারে প্রাথমিকালেই প্রায় ৮০,০০০ গ্রন্থ ছিল। খলীফা নিজেই এগুলো দান করেন। বলা হয় যে, সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় ৪,০০,০০০ এ উপনীত হয়েছিল (Routledge 1999, 167-186)।

নানা বৈশিষ্ট্যের কারণে মুসতানসিরিয়া গ্রন্থাগারের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। খলীফা আল-মুস্তানসিরের উত্তরাধিকারীরা নতুন নতুন গ্রন্থ সংগ্রহ আত্মনিয়োগ করেন। ফলে এক শতাব্দীকাল পরে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যখন বিজয়-গৌরবে ফাতিমিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করেন, তখনও তাতে লক্ষাধিক গ্রন্থের সংগ্রহ তিনি দেখতে পান। মোঙ্গল নেতা হালাকু খাঁর বাগাদাদ আক্রমণের সময় এটি রক্ষা পেলেও তিনি মুসতানসিরিয়ার অধিকাংশ গ্রন্থ নিজ রাজধানী মারাগায় নিয়ে যান। তার অনুরাগভাজন বিজ্ঞানী নাসির উদ্দীন আল তুসীর গ্রন্থাগারে এ মূল্যবান সংগ্রহের অনেকটা স্থান পায়। ১৩৯৩ সালে এটি নিজামিয়া মাদ্রাসার সাথে একীভূত হয়। ১৫৩৪ সালে উসমানীয়রা বাগদাদ দখল করলে প্রাসাদ ও গ্রন্থাগারের বইগুলো

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়। এগুলো ইস্তানবুলের রাজকীয় গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠে এবং মুসতানসিরিয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে নতুন ভবনে মুসতানসিরিয়া মাদ্রাসার কার্যক্রম আবার চালু হয়। ১৯২৭ সালে আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে মূল মাদ্রাসা পুনঃনির্মাণের সময় এটি মুসতানসিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশে পরিণত হয়। সমসাময়িককালে বাগদাদে আরো ছত্রিশটি গ্রান্থাগারের কথা জানা যায়। সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিল দুটি প্রতিষ্ঠান; একটি নিজামিয়া গ্রন্থাগার এবং অপরটি হচ্ছে মুসতানসিরিয়া মাদ্রাসা গ্রন্থাগার।

৪. মিসরের ফাতিমীয় গ্রন্থাগার

ফাতেমীয়[২] খিলাফতের শাসনামলে ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন খলীফাগণ ফাতেমীয় খিলাফতের রাজধানী হিসেবে কায়রো শহর নির্মাণ করেন। তখন সমগ্র মিশর ইসলামী খিলাফতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। যদিও পরবর্তীকালে ১১৭১ সালে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ফাতেমীয় খিলাফতের পতন ঘটিয়ে আইয়ুবীয় রাজবংশের সূচনা করেন এবং একে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে যুক্ত করেন (Karim 2008, 365-380)।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের কারণে তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যানগরীতে পরিণত হয়েছিল মিশরের কায়রো শহর। এ কায়রোতে ফাতেমীয় খলীফা আল আযীয (৯৭৫-৯৯৬ খ্রি.) জ্ঞানী-গুণী, কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের নিরাপদ আশ্রয় দিতেন। তাদের জ্ঞান চর্চার জন্য তিনি ৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে 'দারুল হিকমা' নামে বিরাট এক বিশাল লাইব্রেরী স্থাপন করেন (Ansari 2007, 177)। পরবর্তীকালে খলীফা আল আযীযের পুত্র খলীফা আল-হাকীম (৯৯৬-১০২১ খ্রি.) এ গ্রন্থাগারের শোভা বর্ধন ও সংগ্রহশালা আরো সমৃদ্ধ করেন। ফাতেমীয় গ্রন্থাগার হিসেবে পরিচিত এ গ্রন্থাগার সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মধ্যে তৎকালীন সময়ে সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বাগদাদের বায়তুল হিকমাহর আদলে এটি গড়ে তুলা হয়েছিল। জ্ঞানের সর্ববিধ শাখার পুস্তকে এ লাইব্রেরী ভর্তি ছিল। মোট পুস্তকের সংখ্যা

২. ফাতেমীয় খিলাফত ইসলামী খিলাফতগুলোর মধ্যে চতুর্থতম। পূর্বে লোহিত সাগর থেকে শুরু করে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা এই খিলাফতের অধীন ছিল। এটি তিউনিসিয়াকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই রাজবংশ আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল শাসন করত এবং মিশরকে খিলাফতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। ফাতেমীয়দের দাবি অনুযায়ী তারা মুহাম্মদ স.-এর কন্যা ফাতিমা রা.-এর বংশধর ছিল। এ জন্য এ খিলাফতের নামকরণ হয় ফাতেমীয় খিলাফত। ৯০৯ সালে ফাতেমীয়রা রাজধানী হিসেবে তিউনিসিয়ার মাহদিয়া নামক শহর গড়ে তোলে। ৯৪৮ সালে আল মনসুরিয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। ৯৬৯ সালে তারা মিশর জয় করে এবং ফাতেমীয় খিলাফতের রাজধানী হিসেবে কায়রো শহর নির্মাণ করা হয়। মিশর পুরো খিলাফতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

১,২০,০০০ হতে বিশ লক্ষ পর্যন্ত ছিল বলে বিবরণ পাওয়া যায়। কেবল প্রাচীন জ্ঞানের পুস্তকই ছিল ১৮,০০০। এতদ্‌ভিন্ন ২,৪৫০ টি আল কুরআন বিষয়ক গ্রন্থ, তাবারীর ২০ খানা তারিখ, ইবনে দুরায়দের ১০০ টি কিতাব, জামহারী এবং ইবনে মুকলাহসহ অন্যান্য বিখ্যাত লেখকদের গ্রন্থ এ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল। এছাড়াও হস্তলিপি বিশারদদের লিখিত পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের কপি ও বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ এ গ্রন্থাগারের শোভা বর্ধন করত। ১০৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে উযীর আবুল কাসিত আলী বিন আহমদ এর পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত ও পুস্তকগুলো নতুন করে বাঁধাই ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। বইপত্র সংগ্রহের দিক থেকে 'দারুল হিকমাহ' সেরা স্থানে পরিণত হয়েছিল। ঐতিহাসিক আল মাকরিযীর বর্ণনা মতে, গ্রন্থাগার ভবন ছিল কার্পেট দ্বারা সুসজ্জিত। বহু কর্মকর্তা-কর্মচারী এর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতেন। যাদের পেছনে বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল দুইশত দীনার, জ্ঞান জগতের প্রত্যেকটি বিষয়ের ১৬ লক্ষ গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি 'দারুল হিকমা'র শোভ বর্ধন করেছিল (Kader 2010, 22-28)।

খলীফা আল হাকিমের শাসনামলে ২৪০০ খণ্ডে আল কুরআনের তাফসীরসহ অন্যান্য পুস্তকের সংগ্রহের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০০ । অনুবাদ, পুস্তক বাঁধাই ও লাইব্রেরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করেন (Kader 2010, 22-28)। বর্ণিত আছে যে, ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে উজির আবুল ফারজ সৈন্যবাহিনীর বেতন দেওয়ার জন্য ২৫টি উট বোঝাই বই লুণ্ঠন করে ১ লক্ষ দীনার মূল্যে বিক্রি করে দেন (Amin 2008, 382-383)। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ফাতেমীয় খেলাফতকালে কায়রোতে খলীফারা জ্ঞানী-গুণী ও সর্বসাধারণের জন্য আরো অসংখ্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এসব গ্রন্থাগার জ্ঞান চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

৫. স্পেনের হাকাম গ্রন্থাগার

মুসলমানদের স্পেন বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে এক ঐতিহাসিক অভিযানে মুসলিমরা স্পেন জয় করে (Collin 2012, p. 8–9)। ৮ম শতক থেকে শুরু করে ১৫ শতক পর্যন্ত প্রায় ৮শ' বছর মুসলমানদের শাসনামলে স্পেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চস্থানে উন্নীত হয়েছিল। মুসলিম শাসকরা বিজিত ভূখণ্ডের রাজধানী হিসেবে কর্ডোভাকেই বেছে নেয়। স্পেনের মুসলমানরা বিজিত ভূখণ্ডের সার্বিক উন্নয়নের প্রতি পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করেন। খলীফাদের নিয়োগ করা মোট তেইশ জন প্রশাসক এই ভূখণ্ড শাসন করেছিলেন। এই সময়ের স্পেন ঐশ্বর্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সোনালি যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের এ সোনালি অধ্যায় সৃষ্টির মূলেই ছিল গ্রন্থাগার। মুসলিম স্পেনের সামগ্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম।

দশম শতাব্দীতে স্পেনের কার্ডোভা নগরীতে খলীফা ২য় হাকামের (৯৬১-৭৬ খ্রি.) সময় একটি বৃহৎ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় (Kader 2010, 140)। এ লাইব্রেরীতে যে বিশাল সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ধর্মীয় গ্রন্থাদি, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, আইন ইত্যাদি বিষয়ের পুস্তকাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, সেখানে প্রায় চল্লিশ লাখের অধিক বই পুস্তক সংগ্রহ করা হয়েছিল (Scott 1904, p. 447)। সে সময়েও এ গ্রন্থাগার ব্যবহার করার জন্য মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হতে অসংখ্য পাঠক আগমন করতেন। স্পেনের মুসলিম খলীফাগণ এ গ্রন্থাগারের জন্য প্রাচ্যের রাজধানীসমূহ হতে অন্ততপক্ষে চার (মতান্তরে ছয়) লক্ষ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এই বিরাট লাইব্রেরীর পুস্তকের তালিকা তৈরিতে প্রয়োজন হয়েছিল বিরাট বিরাট রেজিষ্ট্রার, যার সংখ্যা প্রায় ৪০ খণ্ডের অধিক ছিল বলে জানা যায় (Harris 1999, 81.)। খলীফা দ্বিতীয় হাকাম উপহার হিসেবে বই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। সে কারণে তার কাছে উপহার হিসেবে অনেক দামী দামী বই আসত, যা তিনি এ গ্রন্থাগারে জমা দিতেন। খলীফার ব্যক্তিগত একটি গ্রন্থাগার ছিল, যেখানে বই এর সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় লাখের মতো (Hitchcock 2014, 91–92)। পশ্চিমা গবেষকদের গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, দশম শতাব্দীতে ইউরোপে সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী ছিল এ হাকাম লাইব্রেরী। বাগদাদের বায়তুল হিকমাহর পরে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার ছিল।

এই লাইব্রেরীতে প্রায় ১০০ জনের বেশী কর্মচারী-নকলনবিশ ছিলেন, যাদের কাজ ছিল বিভিন্ন ভাষার বই আরবীতে অনুবাদ করা। এরা প্রত্যেকেই এক এক জন ছিলেন অত্যন্ত বিদগ্ধ জ্ঞানী ও পণ্ডিত লোক। এদের মধ্যে মুসলমান ও ইহুদী উভয় ধর্মের পণ্ডিতই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (Najeebabadi 2001, 145)। ৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে খলীফা হাকামের মৃত্যুর পর হতে এই লাইব্রেরীটি জৌলুস হারাতে থাকে। ১০০২ খ্রিস্টাব্দে স্প্যানীয়দের আক্রমণে কার্ডোভা লাইব্রেরীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (Ibid.)।

কেবল গ্রানাডাতেই নয়, বরং পূরো মুসলিম স্পেনে এরকম লাইব্রেরীর সংখ্যা ছিল সত্তরটি। মুসলিম স্পেনের রাজকীয় গ্রন্থাগারের পাশাপশি আরো অনেক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তৎকালীন সেই পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল ছয় লাখ গ্রন্থ। এছাড়াও গ্রানাডার আল হামরা প্রাসাদ সংলগ্ন লাইব্রেরী, সেভিল, টালেডো, মালাগো, ভ্যালেনসিয়া প্রভৃতি শহরে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। পাশাপাশি কর্ডোবা, সেভিল, মালাগা এবং গ্রানাডাসহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রন্থাগার জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমকালীন যুগের পণ্ডিত ব্যক্তিদের এসব লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হতো। লাইব্রেরীর ইতিহাস গবেষকদের মতে-

It was the practice to appoint a librarian to take charge of the affairs of the library. Such a duty was only for the most learned amongst men; those 'of unusual attainment,' were selected as custodians of the libraries (Mackensen 1935, 24).

অথচ এ সময়ে ইউরোপ জুড়ে সবচেয়ে বড় যে পাঠাগারগুলো ছিল, তা ছিল মূলত খ্রিষ্টান পাদ্রীদের মঠে বা গির্জায়। আর ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে, পুরো ইউরোপব্যাপী কোনো গির্জা বা মঠে চারশতের বেশি বই ছিল না (Prescott 1837,188)।

এ সময়ে প্রচুর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী গড়ে উঠছিল। ইবনে ফুতায়েস, আবু আবদুল্লাহ আল হাজরামী (মৃ, ১০০৫/৬ খ্রি.), আবু ওয়ালিদ ইবনে আল মসুল, মানসুরে ক্রীতদাস ফাতিন, আর্কিডোনার প্রখ্যাত লিপিকার কাশিম বিন সাঁদা (মৃ. ৯৮৫ খ্রি.), আবু আলী আল গাসানী, আল জাহানী (মৃ. ১০০৪ খ্রি.), তরতোসার ইয়াহিয়া বিন মালিক বিন আয়িজ (মৃ.৯৮৫ খ্রি.), কর্ডোভার মুহাম্মাদ বিন আজম ইবনুল সবুনী (মৃ. ১০০২ খ্রি.), আবু বকর বিন জাকায়া (মৃ. ১০৪৩ খ্রি.), ইবনে আওয়াল আল মা'আফিরী (মৃ. ১১১ ৮খ্রি.), ইবনে মুখতার (মৃ. ১১৪০ খ্রি.), কর্ডোভার আহমদ বিন মুহাম্মদের কন্যা আয়েশা (মৃ. ১০০৯ খ্রি.), উমাইয়া সভাসদ পত্নী রাজিয়া (মৃ. আনু. ১০৩২ খ্রি.), জাফরের কন্যা খাদিজা, ইবনুল আহদাব (মৃ. ১০৪৫ খ্রি.), আবু বকর ইবনুল আরাবী মুহাম্মাদ ইবনে খায়ের, আল রাজী, কাযী ইবনুল হাজাজ আল লাখমী (মৃ. ১২০৪ খ্রি.), বাদাজোযের অধিবাসী আবু মুজাফফর বিন আল আফতাজ প্রমুখ পণ্ডিত গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব মূল্যবান লাইব্রেরী।

১৪৯২ সালে স্পেনে মুসলমানদের পতনের মাধ্যমে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগারের ভাগ্যে নির্মমতা নেমে আসে (Encyclopædia Britannica 2007)। মুসলিম সাম্রাজ্য ছোট হতে হতে একেবারে গ্রানাডার মানচিত্রে সীমায়িত হয়ে পড়ে। এ গ্রানাডাই ছিল আন্দালুসের শেষ মুসলিম শহর। ২ জানুয়ারি ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনীয় বাহিনী গ্রানাডায় প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দালুসের সর্বশেষ মুসলিম রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নেয়। দখলকারীরা যখন বিজয়ীর বেশে স্পেনে প্রবেশ করে, তখন তারা প্রথমেই এই লাইব্রেরীকে ধ্বংস করে দেয়। বহুসংখ্যক বই-পুস্তককে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি এবং অবশিষ্টগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। স্পেনে মুসলমানদের পতনের ফলে যে বিরাট বিরাট গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়েছে, তা ইতিহাসের এক বিষাদময় ঘটনা।

৬. আল কায়রোয়ান গ্রন্থাগার

মধ্যযুগে মুসলমানদের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রীতির কারণে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রে বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে অনেক গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল (Williams 1987, 207)। মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও বিকাশের ধারাবাহিকতায় মধ্যযুগে আফ্রিকার দেশ মরক্কোর ফেজ-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় (Esposito 2003, 328)। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল আল কায়রোয়ান গ্রন্থাগার। ফাতেমা ফিহরিয়াহ্ (মৃ. ৮৮০ খ্রি.) নামক এক জ্ঞান চর্চায় উৎসাহী মহিলা ৮৫৯ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। সমগ্র আফ্রিকায় এটাই প্রথম গ্রন্থাগার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়। বিশেষ করে ধর্ম, ইতিহাস, আইন, জোর্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়।

১২শ শতাব্দীতে প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ও কবি ইবনু আরবী (মৃ. ১২৪০ খ্রি.) এখানে অধ্যয়ন করেছেন। ১৪শ শতকে বিখ্যাত পণ্ডিত, সমাজ বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ ইবন খালদুন এ প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় (Heffening, 197-200)। মুসলিম বিশ্ব ও ইউরোপের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদানে এ বিশ্ববিদ্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনোস্কো কর্তৃক এটি সবচেয়ে প্রাচীন বিদ্যাঙ্গন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৭. আল আযহার গ্রন্থাগার

ফাতেমীয় খলীফা আল মুইযের (মৃ. ৯৭৫ খ্রি.) নির্দেশে তারই সেনানায়ক জওহর আল সিকিলি (Jawhar aṣ-Ṣaqli) ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফুসতাতের উপকণ্ঠে আধুনিক কায়রো শহর নির্মাণ করেন। এখানেই ৯৭২ খৃস্টাব্দে সেনাপতি জওহর মহানবী সা.-এর কন্যা হযরত ফাতেমাতুয যাহরা রা.-এর স্মরণার্থে 'আল-আযহার' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রথমদিকে এটি শুধু মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ৯৮৮ সালে খলিফা আযীয ৩৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করে এটিকে মসজিদ থেকে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন। পর্যায়ক্রমে এটি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়। এর সাথে এখানে একটি গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা করা হয়। শায়খ সাইয়েদ আল ফারিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শায়খ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। সূচনাকালে আল আযহারে বিভাগ ছিলো ৫টি। তাহলো ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, আইন, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইসলামী দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা। আল আযহারের গ্রন্থাগারের মত সমৃদ্ধ লাইব্রেরী তখনকার মুসলিম বিশ্বে অপ্রতুল ছিল। বিশ্বের প্রাচীন এই জ্ঞানকেন্দ্র 'আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার' আজও সগৌরবে ও বিরমহীনভাবে জ্ঞান বিতরণ করে যাচ্ছে।

৮. মাহমুদীয়া গ্রন্থাগার

মিসরের কায়রোতে মাহমুদীয়া লাইব্রেরী ছিল সে যুগের আরেক বিস্ময়কর গ্রন্থভাণ্ডার। মিসরীয় ওসাদার জামালুদ্দিন মাহমুদ বিন আলী ১৩৯৫ সালে কায়রোয় 'মাহমুদিয়া লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন (Kader 2010, 231)। এ লাইব্রেরীতে বিশাল সংগ্রহ ছিল। এখানে হাতের লেখা অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিল। এ

গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য ছিল পাঠক শুধু গ্রন্থাগারে বসে বই পড়তে পারতো; কিন্তু কোন বই বাইরে নেওয়া যেত না। অবশ্যই পরবর্তীকালে বই ধার দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে অনেক বড় বড় পণ্ডিত গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ইবনে হাজার আল আসকালানী (মৃ. ১৪৪৯ খ্রি.) তাদের অন্যতম (Virk 2016)। ইবনে হাজার এখানে দায়িত্ব পালনকালে বর্ণানুক্রমিক ও বিষয়ভিত্তিক দুটি পুস্তক-তালিকা তৈরি করেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসার প্রচারে এ লাইব্রেরী বিরাট ভূমিকা রেখেছিল।

৯. আদদৌলা গ্রন্থাগার

বুয়াইয়্যা আমীর আযুদুদ দৌলা (৯৪৯-৯৮২ খ্রি.) বুয়াইয়্যার রাজধানী শীরাযে 'আদ দৌলাহ' গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন (Ahmed 2008, 325)। তিনি ছিলেন সমকালীন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। পারস্যের বুয়াইয়্যা সাম্রাজ্যের (৯৩৪-১০৬২ খ্রি.) শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। সুলতান আযুদুদ দৌলা গ্রন্থাগার হাসপাতালসহ বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। সে যুগের প্রায় সব ধরনের পুস্তক ও জ্ঞান-উপকরণ তার প্রতিষ্ঠিত এ বিশাল লাইব্রেরীতে স্থান পেয়েছিল।

এ গ্রন্থাগারে জ্ঞান চর্চার বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হতো। তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ আল-মাকদিসী গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করেছিলেন বলে জানা যায় (Al-Maqdisi 1906, 449)।

১০. বনী আম্মার গ্রন্থাগার

আফ্রিকার দেশ লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলীতে প্রতিষ্ঠিত 'বনী আম্মার গ্রন্থাগার' তৎকালীন সময়ের এক বিশাল লাইব্রেরী। পুস্তক সংগ্রহ ও সেবা প্রদানের জন্য এ লাইব্রেরীর ঐতিহাসিক সুনাম রয়েছে। বিশালতার দিক থেকে এটি ছিল সৃষ্টির এক বিস্ময়কর নিদর্শন। এতে কেবল লেখক বা কপিকারের সংখ্যাই ছিল ১৮০, যারা সর্বক্ষণ বই-এর কপি করার কাজে নিয়োজিত থাকতো। তারা পালাক্রমে রাতদিন কাজ করতো। বনু আম্মার দুর্লভ পুস্তকাদি সংগ্রহ করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। তারা কিছুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও কর্মকর্তাকে কেবল দেশ-বিদেশ থেকে প্রত্যেক শাস্ত্রের দুর্লভ বই-পুস্তক সংগ্রহ করার কাজে নিযুক্ত রেখেছিলেন। এ গ্রন্থাগারের সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় ত্রিশ লাখের উপরে। ইতিহাসবিদদে মতে- ক্রুসেডের সময় ধ্বংস হওয়ার প্রাক্কালে ত্রিপলির এ লাইব্রেরীতে প্রায় ৩০,০০,০০০ বই ছিলো।

উল্লিখিত গ্রন্থাগারসমূহ ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি শহর নগর ও জনাঞ্চলে অসংখ্য গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। বুখারা, সমরখন্দ, নিশাপুর, খাওরিজম, বাগদাদ, দামেস্ক, কায়রো, আলেপ্পো, ত্রিপলী, গ্রানাডা, কর্ডোভা, দিল্লীসহ মুসলিম বিশ্বের সবর্ত্রে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার অনন্য নজির স্থাপিত হয়েছিল (Lévi-Provençal 1948, 67-68)।

পাক-ভারত উপমহাদেশ তথা আমাদের এ অঞ্চলে তৎকালীন সময়ে দিল্লি সালতানের শাসন চলছিল। তেরো শতকের সূচনালগ্নে (১২০৪/০৫ খ্রি.) বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। ইতিহাসের নানা সূত্র থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের অল্পকাল পরেই বাংলাদেশে ইসলামের আগমন শুরু হয়। প্রথমে সাহাবীদের একটি প্রতিনিধি দল ও পরে আরো কিছু ইসলাম প্রচারক দল ও ব্যক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ চলতে থাকে (Rahman 2013, 117)। এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত যে, সপ্তম শতাব্দীতেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন লেখেন-

'Islams contact with Bengal actually began sometime in the 7th century, within a few decades of its emergence in Arabia. The earliest missionaries are belived to have arrived in the part of Asia during the caliphate of Umar' (Hossain 2002, 207).

উমাইয়া খলীফা আল ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) এর সময়কালে হিজাযের গভর্নর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের নির্দেশক্রমে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে ওবাইদুল্লাহ ও পরে বুদাইলের নেতৃত্বে সিন্ধু হতে ২টি অভিযান পরিচালিত হয়। প্রথমে এ ২টি অভিযানই বিফল হয়। অতঃপর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ৭১১ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি ও সতের বৎসর বয়সী তাঁর আপন জামাতা মুহাম্মদ ইবন কাসিমকে সিন্ধু বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ৭১১ সালে বিজয় লাভ করেন (Karim 2007, p.80)। এভাবে সেনাপতি মুহাম্মদ ইবন কাসিম সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করেন। ১০১০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদের (মৃ. ১০৩০ খ্রি.) মুলতান অধিকার করেন, তবে তিনি এখানে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করেনি। এরপর ঘুরীর বংশের প্রতিষ্ঠাতা মাইজ উদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরীর (মৃ. ১২০৬ খ্রি.) ঘুরী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উপমহাদেশের মুসলিম শাসন পাকাপোক্ত হয় (Chawdhuri 2009, 50-51)। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী অকস্মাৎ এক অভিযানের মাধ্যমে বাংলা বিজয় করেন। তাঁর এ বিজয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলে রাজনৈতিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় (Karim, Ibid)। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি কুতুবদ্দীন আইবেক (মৃ. ১২১০ খ্রি.) কর্তৃক নিয়োজিত তুর্কী সেনাপতি। তাঁর বাংলা বিজয় এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে ইসলাম একদিকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যদিকে যে সকল ইসলাম প্রচারক পীর দরবেশ এদেশে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন তাদের কার্যক্রম আরো গতিশীল ও স্থায়িত্ব লাভ করে। ফলে বাংলাসহ সমগ্র উপমহাদেশে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব বিস্তৃত হয় (Khan 2007, 18-19)। ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ মোঘল শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত এ সময়ে ভারতে রাজত্বকারী একাধিক মুসলিম রাজ্য ও শাসন পদ্ধতিকে *দিল্লি সালতানাত* নামে অভিহিত করা হয়। এই সময় বিভিন্ন তুর্কি ও আফগান রাজবংশ দিল্লি শাসন করে। এই রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলি হল: মামলুক সালতানাত (১২০৬-৯০ খ্রি.), খিলজি রাজবংশ (১২৯০-১৩২০ খ্রি.), তুঘলক রাজবংশ (১৩২০-১৪১৩ খ্রি.), সৈয়দ রাজবংশ (১৪১৩-৫১ খ্রি.) এবং লোদি রাজবংশ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রি.)। ১৫২৬ সালে মোঘল শাসনের গোড়াপত্তন হলে দিল্লি সালতানাত উদীয়মান মোঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় (Jamal 2008, 104)।

মুসলমানদের এ দীর্ঘ শাসনামলে শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নতি হয়। বিশেষ করে গ্রন্থ রচনা, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান চর্চার অভূতপূর্ব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

এ উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলিম শাসকদের বেশির ভাগই গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারপ্রেমী ছিলেন। দিল্লীর সুলতানদের অধীনে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অন্ততপক্ষে পাঁচ ধরনের গ্রন্থাগার গড়ে উঠার কথা জানা যায়, এগুলো হচ্ছে প্রাসাদ গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার, খানকাহ বা দরগাহ গ্রন্থাগার, মসজিদ গ্রন্থাগার এবং ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার।

ইসলাম যেহেতু জ্ঞানচর্চার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়, সেহেতু দিল্লী সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা সমস্ত মাদ্রাসায় টেক্সট ও রেফারেন্স বইয়ের একটি বিশেষ সংগ্রহ গড়ে তোলা হতো। গোটা দেশ জুড়ে সুফী দরবেশদের খানকা শরীফে গড়ে ওঠে ধর্মীয় গ্রন্থাবলির সংগ্রহ। সাধারণ মানুষদের পড়ার জন্য মসজিদেও গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হতো। মধ্য যুগে হোসেনশাহী রাজবংশ রাজকীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করে। দিল্লী সালতানাতের প্রথম মহিলা শাসক রাজিয়া সুলতানা (১২০৫ -১২৪০ খ্রি.) একজন ভাল ও দক্ষ শাসক হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তৎকালীন সময়ের পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক তিনি 'আলেমা' উপধিতে ভূষিত হন। তার শাসনামলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সময়ের বিবরণ সম্পর্কিত 'তাবাকাতে নাসিরী' (২৩ খণ্ড) মাওলানা মিনহাজ-ই- শিরাজ কর্তৃক লিখিত বইটি ১২৬০ সালে সম্পন্ন হয় (Sen 2013, 74-76)।

মুসলিম শাসনামলের পুরো সময় জুড়ে সুলতান ও রাজপুত্রদের প্রাসাদের মধ্যেই নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল এবং তারা প্রত্যহ এখানে অধ্যয়নে একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যয় করতেন। এসব গ্রন্থাগার ছিল রাজপ্রসাদের আবশ্যিক অংশ। অপরদিকে রাজপ্রাসাদের বাইরে মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল,

যাতে জনসাধারণ অধ্যয়ন করতেন। খিলজী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান জালাল উদ্দীন খিলজী (মৃ. ১২৯৬ খ্রি.) দিল্লীতে একটি বিশাল রাজকীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এ গ্রন্থাগারে প্রখ্যাত পণ্ডিত আমীর খসরুকে (১৩২৫ খ্রি.) তিনি গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। গ্রন্থাগারিক ও তার দপ্তরকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দপ্তর হিসেবে মর্যাদা দেয়া হতো। দিল্লীর বিখ্যাত সুফী সাধক নিজাম উদ্দীন আওলিয়া (১৩২৫ খ্রি.) তার খানকায় এক সমৃদ্ধ গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে অনেক প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে গাজী খান নামে সম্ভ্রান্ত বংশীয় একজন আফগান নাগরিকের গ্রন্থাগার স্থাপনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থাগার সমাজে ব্যাপকভাবে জ্ঞানের আলো বিতরণ করে সমাজকে আলোকিত করে তুলেছিল। এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামল ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।

মধ্যযুগের গ্রন্থাগারসমূহের কার্যক্রম

মধ্য যুগের মুসলিম শাসনামলে যেসব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলো কেবল গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গ্রন্থাগার ছিল না। এগুলো ছিল একাধারে পাঠশালা, অনুবাদ কেন্দ্র, গবেষণা কেন্দ্র, গ্রন্থ আদান-প্রদান কেন্দ্র, আবাসিক শিক্ষালয়, সভা-সমিতি করার ব্যবস্থাসহ বহুমুখী কার্যক্রমের এক বিশাল প্রতিষ্ঠান। মুসলমানদের সাহিত্যিক অভিরুচি ও বিদ্যোৎসাহী মানসিকতার কারণে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রে এ জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ সময়ের গ্রন্থাগারসমূহ সাধারণত দু'রকমের হতো। যথা: সাধারণ লাইব্রেরী ও বিশেষ লাইব্রেরী। সাধারণ লাইব্রেরী খলীফা, আমীর-ওমরাহ, আলিম ও বিত্তশালী লোকেরা প্রতিষ্ঠা করতো। এর জন্য স্বতন্ত্রভাবে পাকা ভবন নির্মাণ করা হতো এবং অনেক সময় তা মসজিদ ও বিদ্যালয়গুলোর সংলগ্ন থাকতো (Pinto 1929, 227)। এসব লাইব্রেরীতে সুসজ্জিত ক্যাটালগ বা পুস্তক তালিকা থাকত, যা দেখে পাঠক খুব সহজে তার পছন্দের বইটি বের করতে পারত। মুসলিম শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের জন্য যে স্বতন্ত্র ভবন নির্মিত হতো তাতে বহুসংখ্যক কক্ষ থাকতো (Artz 1980, 153)। মাঝখানে বড় আকারের হল থাকত। প্রত্যেক কক্ষ নির্দিষ্ট এক একটা বিষয়ে জন্য নিদিষ্ট থাকতে। যেমন-সাহিত্য পুস্তকের কক্ষ, আইন শাস্ত্রীয় পুস্তকাদির কক্ষ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তকের কক্ষ, অনুরূপভাবে অন্যান্য বিদ্যার জন্য আলাদা আলাদা কক্ষ থাকতো। এসব পাঠকক্ষ অত্যন্ত আরামদায়ক ও উন্নতমানের চেয়ার-টেবিল ইত্যাদিতে সুসজ্জিত থাকতো। পাঠকদের খাওয়া দাওয়া ও ঘুমানোর জন্যও আলাদা কক্ষ থাকতো।

এ ধরনের একটা বিরাট গ্রন্থাগার ভবন ছিল বাগদাদের উপকণ্ঠস্থ কাফস্ নামক এলাকায়। আলী বিন ইয়াহিয়া বিন মুনজিমের প্রতিষ্ঠিত এ গ্রন্থাগারটি ''খাযানায়ে হিকমত '' বা জ্ঞানের ভাণ্ডার নামে পরিচিত ছিল। এখানে বিভিন্ন স্থান থেকে লোকেরা

আসতো, থাকতো ও বই পড়ে জ্ঞানার্জন করতো। এখানে তাদেরকে সব রকমের বই সহজেই সরবরাহ করা হতো। শুধু তাই নয়, জ্ঞানার্জনে উৎসাহী কোনো গরীব শিক্ষার্থী এলে গ্রন্থাগার থেকে তাদের শুধু কাগজ-কালি সরবরাহ করা হতো তাই নয়, বরং ব্যয়ভার বহনের জন্য নগদ অর্থ দিয়েও সহয়তা করা হতো। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোতে কর্মচারী রাখা হতো। এদের মধ্যে যিনি প্রধান থাকতেন, তার উপাধি ছিল ''খাযিনুল মাকতাবা'' বা গ্রন্থাগার পরিচালক। এই পদে সব সময় সমকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হতো (Lévi-Provençal 1948, 67-69)। কাতিব বা লেখক পদেও কিছু লোক নিয়োজিত থাকতো, যারা সুন্দর হস্তাক্ষরে সুন্দর-সুন্দর কপি তৈরি করতো। অনুবাদ কার্যক্রম ছিল এ যুগের গ্রন্থাগারসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন ভাষা হতে আরবী-ফার্সী ভাষায় অনুবাদের জন্য বিশেষজ্ঞ অনুবাদক নিযুক্ত থাকতো। চামড়া দিয়ে বই শক্ত ও সুদৃশ্যভাবে বাইন্ডিং করার জন্য সুদক্ষ বাইন্ডারও ছিল। এসব পদ ছাড়াও আরো কিছু সংখ্যক জনশক্তি গ্রন্থাগারের অন্যান্য জরুরী কাজের জন্য নিযুক্ত থাকতো। প্রত্যেক ছোট ও বড় গ্রন্থাগারের একটা পুস্তক তালিকা থাকতো, যা থেকে সহজেই প্রয়োজনীয় পুস্তক খুঁজে বের করা যেত।

গ্রন্থাগারসমূহকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় আরো বহু কার্যক্রম পরিচালিত হতো। যথা:

ক. বই-পুস্তক/পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

খ. গ্রন্থ সেবা প্রদান

গ. বই ভাড়া প্রদান

ঘ. প্রতিলিপি প্রণয়ন

ঙ. বাইন্ডিং

চ. চিত্রশালা/ মানচিত্র সংরক্ষণ

ছ. অনুবাদ

জ. গ্রন্থ প্রণয়ন

ঝ. বৃত্তি প্রদান

ঞ. গ্রন্থপঞ্জি তৈরি

ট. সামষ্টিক অধ্যয়ন

ঠ. মৌলিক গবেষণা

ড. মানমন্দির

ঢ. আবাসিক শিক্ষালয়

অত্র প্রবন্ধে উল্লিখিত মধ্যযুগের গ্রন্থাগারের তালিকার প্রথম গ্রন্থাগারটি ছিল আব্বাসী আমলে প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের 'বায়তুল হিকমাহ'। এ বায়তুল হিকমাহ ছিল একাধারে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ কার্যালয়। অনুবাদ কাজ ও জ্ঞান গবেষণার মাঝে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাইতুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বায়তুল হিকমা গ্রন্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহণ করে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ ওই গ্রন্থাগারটিতে সংরক্ষিত ছিল। খলীফা হারুন ও তার উজির ইয়াহিয়া বার্মাকীর উদ্যোগে ফার্সী, গ্রিক, মিসরীয়, ভারতীয়, কালদীয় প্রভৃতি ভাষার বই পুস্তক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি এ গ্রন্থাগারটিকে সমৃদ্ধ করেছিল। খলীফা হারুনুর রশিদের পর খলীফা আল মামুনও পিতার মতো বায়তুল হিকমার উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় বায়তুল হিকমার পরিসর বৃদ্ধি পায়। ওই সময় গ্যালেন, হিপোক্রেটিস, ডায়োস-কোরইডিসের রচনাবলি, প্লেটোর রিপাবলিক এবং এরিস্টটলের ক্যাটেগরিজ, ফিজিক্স ও ম্যাগনা মরালিয়াসহ প্রভৃতি গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়। আল মামুনের খেলাফতকালে শুধু গ্রিক রচনাবলি অনুবাদ করতেই বায়তুল হিকমা থেকে প্রায় তিন লাখ দিনার ব্যয় করা হয়েছিল বলে জানা যায়। ওই সময়ে ইসলামের আগের যুগের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ, প্রাচীন আরবের কসীদা ও কবিতা, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, সন্ধিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়। সার্বিক বিবেচনায় খলীফা মামুনের রাজত্বকাল ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গৌরবময় যুগ।

এ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টির মূলে ছিলো বায়তুল হিকমার অবদান। মুসলিম জাহানের খলীফা বায়তুল হিকমায় গবেষণারত পারসিক, হিন্দু, গ্রিক, খ্রিস্টান, আরবীয় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মনীষীদের মাধ্যমে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও বৈদেশিক রাজ্য হতে নানা দেশের জ্ঞান ভাণ্ডারে সঞ্চিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আহরণ করেন। খলীফা আল মামুনের শাসনামলে বায়তুল হিকমাহর সঙ্গেই মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় (Ahmed 2008, 219)। ওই মানমন্দিরে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হতো। খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ ইয়াহিয়া ওই মানমন্দিরে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।

এ সময় প্রতিষ্ঠানটি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, আলকেমি, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোল ও মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানচর্চার অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান হয়ে উঠে। ভারতীয়, গ্রিক ও পারসিয়ান রচনা ব্যবহার করে পণ্ডিতরা বৈশ্বিক জ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডার অর্জন করেন এবং এর মাধ্যমে তাদের নিজেদের আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে যান। নবম শতকের মধ্যভাগে বাইতুল হিকমাহ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ গ্রন্থভাণ্ডার (Al-Khalili 2011, 67-78)। বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের মধ্যে সাহল ইবন হারুন, সাঈদ ইবন হারুন এবং সালাম অন্যতম ছিলেন। ওই তিনজন গ্রন্থাগারিককে 'সাহিব' উপাধি প্রদান করা হয়। বীজগণিতের জনক মুহাম্মদ

ইবন মুসা আল খাওয়ারিজমিও (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেন (Ahmed 2008, 212-213)।

উপরে বর্ণিত গ্রন্থাগারসমূহের বিবরণে উল্লিখিতি হয়েছে যে, বাগদাদের নিজামিয়া গ্রন্থাগার, মুসতানসারিয়া গ্রন্থাগার, কায়রোর ফাতেমীয় গ্রন্থাগার, স্পেনের হাকাম গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে জ্ঞান গবেষণার পাশাপাশি ছাত্রদেরকে বৃত্তিপ্রদানের প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও প্রতিলিপি তৈরি, গ্রন্থপঞ্জি তৈরি, অধ্যয়ন ও গ্রন্থ ধার দেয়া প্রভৃতি ছিল গ্রন্থাগারসমূহের নিয়মিত কার্যক্রম। এ সময়কার গ্রন্থাগারসমূহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছিল মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। মুসলিম স্বর্ণযুগে যেসব মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের কথা আমরা জানতে পারি তার সিংহভাগই এ গ্রন্থাগারে বসে গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন। সে যুগে আজকের দিনের মতো আনুষ্ঠানিক কোনো গবেষণাগার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। এ গ্রন্থাগারগুলোই ছিল উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র। আল-খাওয়ারিজমীর বীজ গণিত আবিষ্কার, ইবনে খলদুনের সমাজ বিজ্ঞান রচনা, আল কিন্দির রসায়ন চর্চা, আল বেরুনীর পদার্থ বিজ্ঞান রচনা, ইবনে সিনার চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব দিগন্ত উন্মোচন প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনার মূল কেন্দ্রস্থল ছিল এ গ্রন্থাগার।

সভ্যতার বিকাশ সাধনে মধ্যযুগের গ্রন্থাগারসমূহের অবদান

সভ্যতার বিকাশ সাধনে মধ্যযুগের গ্রন্থাগারসমূহের বিরাট অবদান রয়েছে। আরবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে ওহীর জ্ঞানের যে আলোকধারা উৎসারিত হয়েছিল এবং তারই সূত্র ধরে জ্ঞানভিত্তিক যে জাগরণের সুত্রপাত হয়েছিল তা কালক্রমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। আরব মুসলমানদের হাত ধরে সে জাগরণের আলোক শিখা এশিয়া আফ্রিকা এবং মুসলিম স্পেন হয়ে ইউরোপের মাটিকে আলোকিত করে। এ নব জাগরণের পিছনে মূলকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে গ্রন্থাগার। এ সময়ে গ্রন্থাগারে বসেই কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, পণ্ডিত, চিত্রকর, দার্শনিক, ভূতত্ত্ববিদ, বণিক, পর্যটক প্রমুখ তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে মানবজাতির শিল্প-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, আইনশাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

তখনকার দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পুণ্যভুমি ছিল আজকের অধঃপতিত মুসলিম নগরসমূহ। মহানবী সা.-এর সময়ে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববীর আবাসিক শিক্ষা কেন্দ্র হতে শুরু করে বাগদাদের বায়তুল হিকমা, বায়তুল হিকমাহ হতে শুরু করে স্পেনের হাকাম গ্রন্থাগার কিংবা ত্রিপলীর বনী আম্মার গ্রন্থাগার অথবা দিল্লী সালতানাতের রাজকীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি ছিল সভ্যতার বিকাশ সাধনে একেকটি উজ্জ্বল বাতিঘর।

বাগদাদের বায়তুল হিকমায় বিশ্বের নানা প্রান্তের মুসলিম-অমুসলিম পণ্ডিতেরা এসে জড়ো হতেন। একদিকে তারা যেমন জ্ঞানের বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করতেন, তেমনি প্রাচীন বিভিন্ন শাখার জ্ঞানকে অনুবাদের মাধ্যমে চিরস্থায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতেন। সভ্যতার বিকাশ সাধনে তাদের এ অনুবাদ কার্যক্রমটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুবাদকর্মে নিয়োজিত পণ্ডিতদের অন্তহীন সাধনায় প্রাচীন গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আরবীতে অনূদিত হয়। এর ফলে বিশ্বমানবতা অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পেরেছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, রোম, চীন, ভারত, গ্রিস, মিশর, পারস্য, উত্তর আফ্রিকা, বাইজান্টাইন প্রভৃতি সভ্যতার জ্ঞান নিয়ে চর্চা হতো সেখানে। এ জ্ঞানসম্ভার প্রথমে আরবীতে অনূদিত হলেও কালক্রমে তুর্কী, সিন্ধী, ল্যাটিন, ফার্সী, হিব্রু, ইংরেজি ইত্যাদি নানা ভাষায় ভাষান্তর হয়ে বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডাকে সমৃদ্ধ করে। আজকের উন্নত বিশ্ব আরবদের হাত ধরে এভাবে প্রাচীন জ্ঞানের অধিকারী হয়ে সমৃদ্ধি লাভ করে। সভ্যতার বিকাশ সাধনে মধ্যযুগের লাইব্রেরীসমূহের অবদান অপরিসীম। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অবদান তুলে ধরা হলো :

১. শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা : মধ্যযুগের গ্রন্থাগারসমূহে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। মুসলিম নৃপতিগণ কুরআনের নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার প্রচার-প্রসারকে ব্রতী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রায় প্রত্যেক মুসলিম শাসকই শিক্ষার প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে আব্বাসী খলিফা মামুন শিক্ষাকে দেশ জয়ের থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি বায়তুল হিকমাহকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উচ্চতর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেন। এ ছাড়াও তিনি সম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

২. লিখন শিল্পের প্রয়োজনে কাগজ উৎপাদন : বায়তুল হিকমাহর অগ্রসরমান ভূমিকার ফলে লিখন শিল্পের ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এ অবস্থায় শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারের জন্য এবং বায়তুল হিকমার কার্যক্রমকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য খলীফা আল মামুন কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করেন (Karim 2008, 266)। কার্যাবলিকে নির্বিঘ্ন করার জন্য আব্বাসী খলীফারা চীনাদের অনুকরণে কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করেন। ৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে আরব দেশে উৎপাদিত কাগজে লিখিত একটি হাদীস গ্রন্থ এখনো ইউরোপের লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (Ibid.)। এ সময় প্রচুর কাগজ উৎপাদনের ফলেই শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

৩. বিদেশী গ্রন্থাবলির অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞানের সম্প্রসারণঃ মধ্যযুগের গ্রন্থাগারসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে অনুবাদ কার্য ছিল অবধারিত। বায়তুল হিকমায়

বসে পণ্ডিতরা বিদেশী বইয়ের অনুবাদ করতেন। এ অনুবাদ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাচীন জ্ঞানের সন্নিবেশে জ্ঞানের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময়ে অনুবাদকর্মের বিশাল এক মহাআয়োজন চলছিল বায়তুল হিকমাহ্সহ অন্যান্য গ্রন্থাগারে। বিভিন্ন ভাষার জ্ঞানকে ধীরে ধীরে আরবী ভাষায় রূপান্তর এবং কালক্রমে অন্যান্য ভাষায় রূপান্তরের কথা তো শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের সময় মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলিম পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। খলীফা হারুন উর রশিদের প্রধান উজির ইয়াহইয়া ইবন খালিদ বার্মাকী ছিলেন তাদের অন্যতম। খ্যাতিমান পণ্ডিতজনের মধ্যে রয়েছেন এরিস্টটলের রচনাবলির অনুবাদকারী আল কিন্দি এবং হিপোক্রিটাসের অনুবাদক হুনাইন ইবনে ইসহাক। বাইতুল হিকমাহ'র অভ্যন্তরে আরবী, ফারসী, আরামাইক, হিব্রু, সিরিয়াক, গ্রিক ও ল্যাটিন সহ বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞানচর্চা করা হত। বিভিন্ন ভাষার রচনাসমূহ আরবীতে অনুবাদের জন্য দক্ষ অনুবাদকদের নিয়োগ দেওয়া হত। ইউহান্না বিন আল-বুতরাক আত-তরজুমান ছিলেন বাইতুল হিকমাহ'র একজন বিখ্যাত অনুবাদক। খলীফা মামুন অনুবাদকদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের অনুবাদের বিনিময়ে তাদের অনুবাদকর্মের সমান ওজনের স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতেন। অনুবাদ বিষয়ক আরো আলোচনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

অনুবাদ কার্যের ক্ষেত্রেও বায়তুল হিকমাহর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। খলীফা আল মামুনের দরবারের উজ্জ্বল রত্ন অনুবাদক হুনাইন ইবনে ইসহাক ছিলেন বায়তুল হিকমার মহাপরিচালক। তাঁর নেতৃত্বে এখানে অনুবাদ কার্যাবলি চলত বিরামহীনভাবে। তিনি নিজে গ্রিক ভাষার শিক্ষা লাভ করে গ্রিক অঞ্চল হতে পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত হন এবং এসব আরবিতে অনুবাদ করেন। এছাড়া বায়তুল হিকমার অন্যান্য অনুবাদকগণ Galen, Pual, Euclid, Ptolemy প্রমুখ মনীষীরা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলি এবং বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল এবং প্লেটোর মূল্যবান গ্রন্থাদি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। এ সময় লিউকের পুত্র কোস্টার এর মাধ্যমে গ্রিক সিরিয়া ও ক্যালডিয় ভাষার গ্রন্থাদি, মানকাহ এবং দাবান নামক ব্রাহ্মন মনীষীদের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদ করা হয়।

৪. স্বতন্ত্র বিভিন্ন শাস্ত্রের বিকাশ লাভ : ইসলামী স্বর্ণযুগের এ সময়ে গ্রন্থাগারের সুবাদে বিভিন্ন বিষয় বিন্যস্ত আকারে আত্মপ্রকাশ করলো। ইতিহাস ভুগোল, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অভিধান, সাহিত্য ও ব্যাকরণ ইত্যাদি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে প্রকাশিত হলো, যা ইতঃপূর্বে অনুপস্থিত ছিল। এ প্রসঙ্গে মিশরীয় লেখক ও চিন্তাবিদ ড. আহমদ আমীন লিখেছেন-

আব্বাসী যুগের আবির্ভাব থেকে আমরা জ্ঞান চর্চার ভিন্ন অভিপ্রকাশ দেখতে পেলাম। মুসলিম জাহানের সর্বত্র জাগতিক শাস্ত্র চর্চার অভূতপূর্ব জোয়ার এলো। দর্শন, যুক্তিবিদ্যা থেকে শুরু করে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা পর্যন্ত সকল গ্রিক শাস্ত্র এবং ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা আরবীতে অনূদিত হলো। পারসিক, গ্রিক, রোমক ও অন্যান্য জাতির ইতিহাসও অনুবাদের আওতায় চলে এলো (Amin 2002, 2/14)।

তিনি আরো বলেন - আব্বাসী যুগে এসে জ্ঞান ও শাস্ত্র পৃথক পৃথক সত্তা লাভ করলো এবং প্রতিটি শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হলো, এমনকি একই শাস্ত্রের সদৃশ বিষয়গুলো এক অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো (Ibid, 2/17)।

বহুমুখী কার্যক্রমের চারণভূমি বায়তুল হিকমাহকে কেন্দ্র করে জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের এসব মহাআয়োজন পরিচালিত হয়। খালিদ বিন আব্দুল মালিক, ইয়াহইয়া বিন আল মানসূর, সিন্দ ইবনে আলী প্রমুখ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদগণ বায়তুল হিকমার উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তারা মানুষের স্থাপিত মানমন্দিরে গবেষণা করে তৎকালে পৃথিবীর আকৃতি, গ্রহ, বিষুব রেখা, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। বায়তুল হিকমা চিকিৎসার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। যুগ শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও ভূগোলবিদ মুহাম্মাদ বিন মূসা আল খাওয়ারিজমী বায়তুল হিকমার একজন মৌলিক গণিত গবেষক ছিলেন। গণিত শাস্ত্রের উপর রচিত *কিতাবুল জাবর ওয়াল মুকাবালা* গ্রন্থটি তার অনবদ্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থটি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে টেক্সট বই হিসেবে পড়নো হতো। এ সময়ে ইতিহাস, সাহিত্য, ভুগোলবিদ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্রের অভাবনীয় বিকাশ ঘটে। ড. আহমদ আমীন বলেন-

"অন্যদিকে আলিমগণ দর্শন, গণিত, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্রের গ্রন্থের অনুবাদ ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। সুতরাং সে যুগে ছিল না এমন কোন শাস্ত্রের কথা আর বলা যায়? পরবর্তীতে যা হয়েছে, তা তো শুধু বৃদ্ধি ও পুষ্টি এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ এবং কল্যাণকর বা ক্ষতিকর ব্যাখ্যা পর্যালোচনার সংযোজন (Ibid. 2/14)।"

৫. মৌলিক গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন : বায়তুল হিকমার গবেষকগণ উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রিক, পারস্য ও ভারতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় অনুভূতির পরিবর্তে বিচার বুদ্ধি, যুক্তি-তর্ক, প্রগাঢ় অনুশীলন দ্বারা মুসলমানগণ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখতে সক্ষম হন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই সাফল্য বিজ্ঞান বা সাহিত্যের কোন বিশেষ শাখায় সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি বুদ্ধিবৃত্তির যাবতীয় শাখায় প্রসার লাভ করেছিল।

৬. ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ : বায়তুল হিকমা জ্ঞান বিজ্ঞানে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল এর ফলে ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ সূচনা হয়েছিল। ঐতিহাসিক মুইর বলেন, এই সমস্ত মনীষীদের পরিশ্রমের ফলে মধ্য যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপীয় জাতিগুলোর সাথে তাদের অথচ বিস্তৃত পৈত্রিক সম্পদ গ্রিসের বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে পুনর্মিলন ঘটে। অনেক ঐতিহাসিক একে The golden age of Islamic civilization বলে অভিহিত করেছেন। আবার অনেকে একে Augustan age বলেও আখ্যায়িত করেছেন (Karim 2008, 237)।

মিসরীয় লেখক ও চিন্তাবিদ ড. আহমদ আমীন এ প্রসঙ্গে লেখেন- 'মোট কথা, উমাইয়া শাসনের শেষদিক থেকে শুরু করে আব্বাসীয় সালতানাতের প্রথমদিক পর্যন্ত মোট পঞ্চাশ বছরের কম সময়ের মধ্যে অধিকাংশ জ্ঞান ও শাস্ত্র বিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হোক তা বাণীনির্ভর জ্ঞান তথা তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসুলুল ফিকহ, কিংবা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক জ্ঞান কিংবা বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান তথা গণিত, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, কালাম ইত্যাদি। মুসলিম জাতির এ বুদ্ধিভিত্তিক উদ্দীপনা ও কর্মযজ্ঞ অন্যান্য জাতির অবাক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল (Amin 2002, 2/24-25)।

মূলত এ যুগটি ছিল জ্ঞান–বিজ্ঞানের স্বর্ণ যুগ। বিশেষ করে আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন (মৃ. ৮৩৩ খ্রি.) -এর সময়কালে (৮১৩ - ৮৩৩ খ্রি.) জ্ঞান–বিজ্ঞানের আকাশচুম্বী ও বিস্ময়কর উন্নতি হয়। তিনি নিজেও ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং তাঁর সকাশে সন্নিবেশিত হয়েছিল আরো হাজারো পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিবর্গ (Karim 2008, 36)। তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছিল জ্ঞান সৃষ্টি, চর্চা ও বিকাশের এক বিরাট ইনিষ্টিটিউট বা গবেষণাগার। ইতিহাস বিখ্যাত গ্রন্থাগার 'বায়তুল হিকমাহ' তৈরি হয়েছিল এ যুগে। যে বায়তুল হিকমাহ্তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল জ্ঞানের সমাহার ঘটেছিল।

ইসলামী স্বর্ণযুগের আরেকটি উল্লেখ্যযোগ্য উর্বরভূমি হচ্ছে মুসলিম স্পেন। মুসলিম স্পেনের প্রত্যেক শাসকই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী। তন্মধ্যে তৃতীয় আবদুর রহমান, হাকাম (২য়) এবং মনসুরের নাম বিশিষ্টতার দাবিদার। তারা ছিলেন মূলত মুসলিম স্পেনের স্বর্ণযুগের পৃষ্ঠপোষক, বোদ্ধাশাসক। স্পেনের এ সোনালি অধ্যায় সৃষ্টিতে আরো যারা অগ্রণী ছিলেন, তারা হলেন বিজ্ঞানী, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মী। গোটা স্পেনেই ছিল জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার এক আদর্শভূমি। বিশিষ্টদের মধ্যে দার্শনিক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসাররাহ (৯৩১ খ্রি.), ঐতিহাসিক ইবনুল আহমার (৯৬৯ খ্রি.), জ্যোতির্বিদ আহমদ বিন নসর (৯৪৪ খ্রি.), মাসলামাহ বিন কাসিম (৯৬৪ খ্রি.), চিকিৎসক আরীব বিন সাঈদ আল-কুরতুবী, ইয়াহিয়া বিন ইসহাক অন্যতম। ইমাম কুরতুবীর বিখ্যাত তাফসির 'আল জামি লি আহকামিল কুরআন' আজও মুসলিম বিশ্বের গ্রন্থাগারসমূহের অমূল্য সংযোজন। ইমাম কুরতুবী

ছিলেন এই মাটির স্বর্ণসন্তান। মুসলিম স্পেনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব জ্ঞানীই উপযুক্ত মর্যাদা পেতেন। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, মধ্যযুগের ইউরোপের মুসিলম স্পেন ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও বিকাশের এক স্বর্গভূমি।

সোনালি যুগের অবসান ও গ্রন্থাগারের নিমর্ম পরিণতি

সোনালি যুগে মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা এবং তা সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা ইসলামের ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়। এর মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকে কালক্রমে গড়ে ওঠা মানব সভ্যতার উত্তরাধিকার মুসলমানদের হাত ধরে ইসলামী সভ্যতা হিসেবে বিকাশ লাভ করে। পরবর্তীকালে মুসলমানদের সোনালি দিনের উৎসারিত রসনির্যাস ইউরোপীয় রেনেসাঁর মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতায় আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিভাবে মুসলমানদের সেই সোনালি যুগের অবসান হলো এবং জ্ঞান চর্চা ও বিকাশের পথ থেকে মুসলমানরা সরে আসল তা এক বিরাট প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর মিলাতে গিয়ে গবেষকরা যেসব কার্যকারণগুলো খুঁজে পেয়েছেন তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়যুক্ত রয়েছে। এগারো শতকে শুরু হওয়া ক্রুসেড[৩] বা খ্রিস্টানদের চাপিয়ে দেয়া ধর্মীয় যুদ্ধ গোটা মুসলিম বিশ্বকে অস্থিতিশীল করে তোলে। ইউরোপীয় শাসকেরা ধর্মীয় এবং বাণিজ্যিক অভিপ্রায়ে জেরুজালেমকে মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নেয়ার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শুরু করেন ক্রুসেডের এই যুদ্ধ। ইউরোপীয় শাসকদের শুরু করা সে যুদ্ধ নানা স্তরে চলতে থাকে প্রায় তেরশো শতাব্দীর শেষ অবধিকাল পর্যন্ত। তাদের চাপিয়ে দেয়া নির্মম সে যুদ্ধে হত্যা, নির্যাতন, দখলদারিত্ব, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, অমানবিক অত্যাচারসহ নানা প্রকার জুলম নির্যাতন এবং হাজার বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া এ যুদ্ধের সামাল দিতে গিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। এর মধ্যেই অর্থাৎ ১৩ শতকের শতকের মাঝামাঝিতে ধুঁকতে থাকা মুসলিম বিশ্বের সামনে এসে দাঁড়ায় আরেক ত্রাস-মোঙ্গলদের আক্রমণ। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, মঙ্গোলদের এ আক্রমণই ছিলো ইসলামের সোনালি যুগের

৩. সাধারণভাবে বিশ্বইতিহাসে ক্রুসেড বলতে পবিত্র ভূমি অর্থাৎ জেরুজালেম এবং কন্সটান্টিনোপল এর অধিকার নেয়ার জন্য ইউরোপের খ্রিস্টানদের সম্মিলিত শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ১০৯৫-১২৯১ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকবার যে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করে সেগুলোকে বোঝায়। Crusade শব্দটি ফরাসি croisade ও স্পেনিস cruzada শব্দ হতে উদ্ভূত একটি আধুনিক ইংরেজি শব্দ। অক্সফোর্ড ডিকশোনারির ভাষ্যমতে, এর অর্থ হচ্ছে কোন কিছু পাওয়া বা অর্জন করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মূলত ক্রুসেড দ্বারা ধর্মীয় যুদ্ধ বোঝানো হয়। পোপ দ্বিতীয় আরবানের আবেদনক্রমে ইউরোপের ডব্লষ্টান রাজ্যসমূহ জোটবদ্ধ হয়ে মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম রাজ্যসমূহের বিরুদ্ধে ১০৯৬ সাল হতে ১২৯২ সাল পর্যন্ত যে সকল ধর্মীয় যুদ্ধ ও অভিযান পরিচালনা করে ইতিহাসে তা ক্রুসেড যুদ্ধ নামে পরিচিত। (সূত্র : ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নবম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।)

অবসানের মূল কারণ (Ali 2008, 286-287)। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁনের নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ায় গড়ে উঠেছিলো শক্তিশালী মোঙ্গল সাম্রাজ্য। ১২৫৮ সালের ২৯ জানুয়ারি তারই বংশধর হালাকু খাঁনের নেতৃত্বে মোঙ্গল বাহিনী ও তার মিত্র শক্তিদের সামনে তছনছ হয়ে যায় আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী সমৃদ্ধ নগরী বাগদাদ (Ibid.)। বাগদাদে যখন তাতারীদের বর্বরোচিত ধ্বংসাভিযান শুরু হয়, তখন সর্বপ্রথমে তারা এই লাইব্রেরীগুলোকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। নিরক্ষর তাতারীরা যা কিছু পেয়েছে, নির্বিচারে দজলা নদীতে নিক্ষেপ করেছে। এত বই-পুস্তক নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে দজলা নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

অপরদিকে ক্রুসেড যুদ্ধের চলমান ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে ত্রিপোলী, বাইতুল মুকাদ্দাস, আসকালান প্রভৃতি শহরের অবশিষ্ট সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থগার ধ্বংস হয়ে যায়।

১৪৯২ সালে আইবেরীয় উপদ্বীপের শেষ মুসলিম রাজ্য গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়ে স্পেনের মুসলমানরা মুখোমুখি হয় এক নতুন পরিস্থিতির। দেশব্যাপী এই গ্রন্থপ্রীতি এবং গণগ্রন্থগারের সম্পদ রাজনৈতিক বর্বরতায় আনেকটা ধ্বংস হয়ে যায়। ১৪৯২ সালে খ্রিস্টানদের হাতে স্পেনের পতনে স্পেনের মুসলমাদের মতো এই বইয়ের ভাগ্যেও অমানিশা নেমে আসে। বাগদাদের দজলা নদীর মতো কর্ডোভা লাইব্রেরীর গ্রন্থসমূহের ধ্বংসাবশেষের স্তুপে গোয়াদেল কুইভার নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো (Ibid. 404-405)।

সোনালি যুগের পতনের অন্যান্য কারণের মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মুসলিম সম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, শিয়া-সুন্নি বিরোধ, কর্মবিমুখ আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্নতা, সর্বোপরি যোগ্য নেতৃত্বের অভাবসহ আরো নানা কারণে ক্রমান্বয়ে ইসলামের রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের অবসান হয়। ইন্ডিয়ান মুসলিম স্কলার সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (মৃ. ১৪২১ হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' এর মধ্যে ইসলামী সভ্যতার পতনের কারণগুলো সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে জিহাদ ও গবেষণার অনুপস্থিতি, ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি, রাজা-বাদশাদের নৈতিক অধঃপতন, বাস্তবতাবিমুখ দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় গভীর মনোযোগ, সর্বোপরি রাজনৈতিক চক্রান্ত ও ঘটনা প্রবাহ ইত্যাদি।

ইসলামের ইতিহাসের সে সোনালি যুগের অবসানের ফলে হাজার বছরের লালিত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আধার গ্রন্থাগারসমূহও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এসব গ্রন্থাগার ধ্বংসের মূলে কখনো ছিলো পরাজিত পক্ষের উপর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ, কখনো ছিলো ভিন্ন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, কীর্তি ও আবিষ্কারকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা। এর মাধ্যমে মানবজাতি হারিয়েছে হাজার বছরের সাধনার ফসল ঐতিহ্যবাহী সকল গ্রন্থাগার। এতদ্সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম

গ্রন্থাগারসমূহের বিক্ষিপ্ত কিছু অংশ বর্তমানেও বিদ্যমান রয়েছে তা বিস্ময়কর। এসব গ্রন্থাগারের মধ্যে তুরস্কের ইস্তাম্বুল লাইব্রেরী যাদুঘর, দামিস্কের যাহিরিয়া লাইব্রেরী, তিউনিসের বড় বড় মসজিদ লাইব্রেরী, ইয়েমেনের সানায় ইমাম ইয়াহিয়ার বিশাল সংগ্রহ, নজদ ও কারাবালার সমাধি ভবন সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীসমূহে বেশ কিছু দুর্লভ গ্রন্থাগার মুসলিম গৌরবের সাক্ষী হয়ে রয়েছে (Kader 229-230)। উপমহাদেশে কয়েকশ বছরের মুসলিম শাসনামলে জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি মুসলমানরা নজীরবিহীন ও উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। মোটকথা, যেখানেই মুসলমানদের পদার্পণ ঘটেছে সেখানেই তারা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য অবিরাম কাজ করে গেছেন।

উপসংহার

প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে জ্ঞান সৃষ্টি, বিকাশ ও সংরক্ষণ এবং বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। সভ্যতার বিকাশ সাধনে গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম। প্রথম দিকে মানুষ নিজের ঘরের কোণে, মন্দিরে, মসজিদে উপাসনালয়ে এবং রাজকীয় ভবনে গ্রন্থ সংরক্ষণ করার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম শুরু করলেও পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সেটা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করে। প্রাচীন সভ্যতায় জ্ঞান চর্চা ও বিতরণের অন্যতম কেন্দ্র ছিল এ গ্রন্থাগার। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার তার ক্রমবিকাশ অব্যাহত রাখে। বিশেষ করে মসজিদ গ্রন্থাগারের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম সভ্যতায় সোনালি যুগ সৃষ্টির পেছনে এসব গ্রন্থাগার মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তৎকালীন সময়ে গ্রন্থাগারগুলো একাধারে গ্রন্থ সংগ্রহশালা, বিদ্যাঙ্গন, গবেষণা কেন্দ্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসহ বহুমুখী ভূমিকা পালন করে। আব্বাসী শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের 'বায়তুল হিকমাহ' জ্ঞান বিজ্ঞান সৃষ্টি, চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল তা নজিরবিহীন ও বিস্ময়কর। জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার নবজাগরণ ও মুসলিম সভ্যতার বিকাশে এ গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম। আব্বাসী আমলে প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের বায়তুল হিকমাহর পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলোর অবদানও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এসব গ্রন্থাগারের অবদান শুধু মুসলিম সভ্যতায় নয়, বরং আজকের আধুনিক সভ্যতায়ও নানাভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে। আধুনিক সভ্যতার নানা আবিষ্কার, সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের পিছনে এ গ্রন্থাগারগুলোর মুল্যবান ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু মুসলিম সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলোকে যে নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তা অতীব মর্মন্তুদ, দুঃখজনক ও অনাকাঙ্ক্ষিত। এ ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে শুধু মুসলিম সভ্যতা নয়, পুরো মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। মানব সমাজ যতদিন পৃথিবীতে বর্তমান থাকবে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনও ততদিন সমভাবে অবশিষ্ট থাকবে। আধুনিক বিশ্বের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আরো বহুগুণে বাড়ছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী যেমন বলেছিলেন- "আমরা যত বেশি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে। আমার

মনে হয়, এদেশে লাইব্রেরীর সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি।" তার এ মন্তব্যটি বর্তমানে আমাদের দেশ ও সমগ্র বিশ্বের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। জাগতিক সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তির জন্য আমাদের সমাজে সর্বস্তরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা অতীব জরুরী। সুন্দর সমাজ ও আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, হাসপাতাল, বন্দর, মসজিদ, মন্দির, মার্কেট, খেলাঘরসহ প্রত্যেক জনবসতিতে গ্রন্থাগার প্রয়োজন। মসজিদ কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় আমাদের মনোযোগী হতে হবে। সমাজের সর্বত্রে অসংখ্য মসজিদ রয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজের সর্বস্তরে জ্ঞান চর্চা ও বিতরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমাদের বিদ্যমান গ্রন্থাগারগুলোকে কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও খুবই জরুরী। আমাদের বিদ্যমান গ্রন্থাগারগুলোকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়ন করার পাশাপাশি এর কর্মপরিধি বৃদ্ধি করা সময়ের দাবী। গ্রন্থাগারগুলো হবে একাধারে পাঠকেন্দ্র, গ্রন্থসংগ্রহশালা, অনুবাদকেন্দ্র, গবেষণাকেন্দ্র, বিজ্ঞানগবেষণাগার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে জ্ঞানভিত্তিক নানা কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হবে। গ্রন্থাগারে আগত পাঠক, গবেষক ও অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করাও একটি মৌলিক দাবী। বিশেষ করে পাঠক-গবেষকরা অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থাগারে রাত্রিযাপন করতে চাইলে যেন করতে পারেন, সে ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারে গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা এবং পাঠকদের বৃত্তি, পুরস্কার প্রদানসহ উৎসাহমূলক নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে গ্রন্থাগারসমূহের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। মানবতার জাগতিক উন্নতি ও আত্মিক চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে গ্রন্থাগার চিরভাস্বর হয়ে থাকুক, এটাই প্রত্যাশা।

Bibliography

Abdul Aziz, Muhammad. 2013. *Laibrary Bebosthapona.* Dhaka : Friends Book Corner.

Ahmed, Dr. Hasanuddin. 2008. *A Concise History of Islam.* New Delhi: Good Word Book.

Ali, Syed Amir. 2008. *Arob Jatir Itihas*. Translated by: Sheikh Riaj Uddin Ahmad. Dhaka: Bangla Academy.

Al-Khalili, Jim. 2011. *The House of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance.* Penguin Publishing Group.

Amin, Dr. Ahmad. 2002. *Duhal Islam.* Translated by: Abu Taher Misbah. Dhaka: Bangladesh Islamic Foundation.

Ansari, Musa. 2007. *Madhyajuger Muslim Shabhyota o Shangshkriti*. Dhaka: Choyonika Prokashoni.

Artz, Frederick B.1980.*The Mind of the Middle Ages: An Historical Survey*. USA: The University of Chicago Press.

Banglapedia, National Encyclopedia of Bangladesh (Second ed.). Asiatic Society of Bangladesh.

Brentjes, Sonja; Robert G. Morrison. 2010. *The Sciences in Islamic Societies,* The New Cambridge History of Islam, V-4. Cambridge: Cambridge University Press.

Casson, Lionel. 2002. *Libraries in the Ancient World.* Yale: Yale University Press.

Chawdhuri, Hassan Ali. 2009. *Bharotiyo Upomohadesher Itihas*. Dhaka: Ideal Books.

Collins, Roger. 2012. *Caliphs and Kings: Spain, 796-1031*. John Wiley & Sons.

*Encyclopædia Britannica (*online version*)*. 2019.

Esposito, John L. 2000. *The Oxford History of Islam*. Oxford: Oxford University Press.

Griffel, Frank. 2009. *Al-Ghazālī's Philosophical Theology*. Oxford: Oxford University Press.

Hamidullah, Dr. Muhammad. 2012. *Emergence of Islam*. Translated by: Muhammad Zubaer. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre.

Harris, Michael H. 1999. *History of libraries in the western world*. Metuchen, N.J: Scarecrow Press.

Hitchcock, Richard. 2014. *Muslim Spain Reconsidered: From 711 to 1502*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Hitti. P.K. 1973. *Capital Cities of Arab Islam.* University of Minnesota Press.

Hossain, Syed Sajjad. 2002. *Civilization and Society.* Dhaka: Bangladesh Institute of Islamic Thought.

Hossen, Dr. Abu Muhammad Delowar; Shikder, Dr. Muhammad Abdul Kuddus. 2004. *Shabhyotar Itihas : Prachin o Madhyajug*. Dhaka: Bishyabidyaloy Prokashoni.

Ibn Kathir, Imaduddin Abu al-Fida. *Al-Bidaya wa al-Nihaya*. Cairo: Matba al-Sadiyah.

Islami Bishyakosh. 1994. Dhaka: Bangladesh Islamic Foundation.

Jamal Malik. 2008. *Islam in South Asia: A Short History*. Brill Publishers.

Jochum, Uwe. Ô*The Alexandrian Library and its Aftermath*Õ from Journal *Library and Information History,* vol-15 (1999). Published online: 18 Jul 2013.

Josef, W. Meri, & Bacharach, Jere L. 2006. *Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia. Vol. 1 Index A – K.* Taylor & Francis.

Kader, Dr. M. Abdul. 2010. *Muslim Kirti.* Dhaka: Bangladesh Islamic Foundation.

Karim, Muhammad Reza-e-. 2008. *Arob Jatir Itihas*. Dhaka: Bangla Academy.

Khan, Abbas Ali. 2007. *Banglar Musolmander Itihas*. Dhaka: Bangladeh Islamic Centre.

Khan, Shahadat Hossen. 2012. *Shorno Juge Muslim Bigyanider Abishkar*. Dhaka: Afsar Brothers.

Lévi-Provençal, Évariste. 1948. *Nukhab Tarikhiya Jamia li Akhbar al-Maghrib.* Paris: La Rose.

Mackensen, R. S. *ÔBackground of the History of Muslim LibrariesÕ*, The American Journal of Semitic languages and literatures, v-51 (January 1935).

Makdisi, George. *Madrasa and University in the Middle Ages*, Studia Islamica, No. 32 (1970). Published by: Brill

Murray, Stuart A.P. 2012. *The Library: An Illustrated History*. Chicago: American Library Association.

Najeebabadi, Akbar Shah. 2001. *The History of Islam V.3*. Riyadh: Darussalam.

Najeebabadi, Akbar Shah. 2008. *Islamer Itihas*. Translated by Abdul Mantin Jalalabadi and Abdullah bin Saeed Jalalabadi. Dhaka: Bangladesh Islamic Foundation.

O`Leary, De Lacy. 2002. *How Greek Science Passed to the Arabs*. New Delhi: Goodwards.

Pinto, O. *The Libraries of the Arabs during the time of the Abbasids*, Islamic Culture, v- 3 (1929).

Polastron, Lucien X. 2007. *Books On Fire: The Tumultuous Story Of The World's Great Libraries*, Thames & London: Hudson Ltd.

Prescott, William Hickling .1837. *The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic*.

Rahman, Mahbubur. 2013. *Bangladesher Itihas*. Dhaka: Turjo Prokashoni.

Roberts, John Morris. 1997. *A Short History of the World.* Oxford University Press.

Routledge, Hill Donald. *Arabic Mechanical Engineering: Survey of the Historical Sources,* Arabic Sciences and Philosophy: A Historical Journal (1999). Cambridge University Press

Ruth Stellhorn. *Background of the Nistroy of Moslem Libraries,*(America Journal of Semetic Languages (1935).

Scharfe, Hartmut. 2002. *Education in Ancient India*; *Handbook of Oriental Studies*. Brill.

Scott, Samuel Parsons. 1904. *History of the Moorish Empire in Europe Vol. 3*. Lippincott.

Sen, Sailendra. 2013. *A Textbook of Medieval Indian History*. Primus Books.

SOED. Shorter Oxford English Dictionary. Oxford University Press

Stille, Alexander. 2002. *The Future of the Past* (*chapter: "The Return of the Vanished Library*"). New York: Farrar, Straus and Giroux.

Tagore, Rabindranath. 2011. *Bichitra Probondho (Library).* Dhaka: Books Fair.

Virk, Zakaria. *Libraries of the Muslim World (859-2000*), https://themuslimtimes.info/2016/08/28/libraries-of-the-muslim-world

W. Heffening; J.D. Pearson. *Maktba',* Encyclopaedia of Islam, First Edition (1913-1936). Netherlands: Brill Publishers.

Wani, Z. A., & Maqbol, T. 2012. *The Islamic Era and Its Importance to Knowledge and the Development of Libraries*. Library Philosophy & Practice.

Wedgeworth, Robert. 1993. World Encyclopedia of Library and Information Services. Chicago: American Library Association.

Williams, Chancellor. 1987. *The Destruction of Black Civilization*. Chicago: Third World Press.